

গল্প-সঞ্চয়ন

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal,
as Bengali Rapid Reader (Prose) for Class VIII
(Vide Notification No. Syl. *65/55*, dated *18th October, 1955*
and Calcutta Gazette, dated *24th November, 1955.*)

গল্প-সঞ্চয়ন

(মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে অষ্টম
শ্রেণীর দ্রুতপঠনের জন্য লিখিত ও অনুমোদিত)



পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

একমাত্র পরিবেশক :
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির পক্ষে
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সংশোধিত (তৃতীয়) সংস্করণ

মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-এর নির্দেশানুযায়ী অষ্টম মানের দ্রুত-পঠনের জন্য এই ছোটগল্প-সংকলন প্রকাশ করা হইল। ছোটগল্পে বাঙলা সাহিত্য গৌরবসমৃদ্ধ। ভারতীয় অন্য কোন সাহিত্যে এ-সমৃদ্ধির তুলনা বিরল। বিশ্ব-সাহিত্যেও বাঙালী সাহিত্যিকের এই কৃতিত্ব মর্যাদার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রাজা। তাঁহার উত্তর-সূরিগণও ছোটগল্প রচনায় সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সৃষ্টিপ্রবণতা বোধ করি বাঙালীর ভাবপ্রকৃতির অনুকূল। অতএব এই সৃষ্টির সহিত ছাত্রদের পরিচয় থাকা একান্ত দরকার বলিয়া মনে হয়।

এই সংকলন গ্রন্থে কবিগুরুকে পুরোধা পুরুষ রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার এবং আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা সন্নিবিষ্ট করা হইল। এই প্রসঙ্গে ছোটগল্পের আঙ্গিক অর্থাৎ গঠনরীতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা সম্ভবতঃ অবান্তর হইবে না। ছোটগল্প গদ্যে গীতি-কবিতা; খণ্ড জীবনের অখণ্ড, সমগ্র এবং স্বয়ংপূর্ণ কাহিনী। সত্য কথা, ইহাতে উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার গভীরতা কম নহে—বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতই, অথবা শঙ্খে সমুদ্র-সংগীতের মতই ইহা চকিতে বিরাট ও গভীরের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। স্বল্প পরিসরে সংযত ভাষণের মধ্যে গভীর কথা পাঠকের গোচর করাই রচয়িতার উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে ছোটগল্পের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছোটগল্পগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্যের সার্থকতা বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে একটি কিশোরের করুণ

কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মাতৃস্নেহের কাঙাল ফটিক মামার বাড়ীতে মামীমার অনাদরে ও অত্যাচারে চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার এই চলিয়া যাওয়া পাঠক-হৃদয়কে বেদনায় আপ্লুত করিয়া দেয়।

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর 'জয়-পরাজয়' গল্পটিও দুইটি কিশোরকে কেন্দ্র করিয়া লেখা। ইহা দুইটি কিশোর-চিত্তের দ্বন্দ্ব-দোলায়িত বেদনা-মধুর আলেখ্য। ফটিকের আপাত-রুক্ষতার অন্তরালে করুণার নির্ঝর ও হরেনের কর্তব্যপরায়ণতা সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পরাজয়বরণ আত্মোৎসর্গের মহৎ দৃষ্টান্ত।

প্রভাতবাবুর 'আদরিণী' ও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প দুইটির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্নেহবন্ধনের করুণ কাহিনী ইহাদের বিষয়বস্তু। এই বন্ধন যেমন গভীর তেমনই দুশ্ছেদ্য। ঘটনাচক্রে যেদিন এই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে সেদিন জীবন অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। জয়রাম মুখুজ্যে দারিদ্র্যবশতঃ নন্দিনী-সদৃশ প্রিয় আদরিণীকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, পথে আদরিণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই মৃত্যু কন্যাশোকের মতই তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ আর অধিক দিন বাঁচেন নাই। 'মহেশ' গল্পে নিপীড়িত ও বিমূঢ় গফুর শেষ পর্যন্ত পুত্রসদৃশ একান্ত স্নেহের পাত্র মহেশকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত পরিণাম এমন অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছে যে পাঠক বিস্ময়ে ও বেদনায় হতবাক্ হইয়া পড়ে। জীবনের গভীর ও বিচিত্র রূপের ইহা এক অপূর্ব পরিচয়।

প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' একটি চমৎকার গল্প। লেঠেলদের কাহিনী লইয়া গল্পটির সূচনা ও সমাপ্তি। মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ একাগ্র মননশক্তি দৈবশক্তির মতই প্রবল, এই রহস্যই এই গল্পে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। মনিরুদ্দি সর্দার, মিছু, হেদাৎউল্লা ও ঈশ্বর পাটনী প্রভৃতি লেঠেলদের

বর্ণনা, তাহাদের কথাবার্তা কার্যাবলী বাস্তব চিত্রের মতই চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গল্প বলার ভঙ্গিটিও চমৎকার।

কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বাঙলা সাহিত্যে যিনি 'দাদা মহাশয়') 'কালী ঘরামি' গল্পে সহজ ও সরল জীবনের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ছোট-বড়ো-নির্বিশেষে মানব জীবনের একটি সহজ মহিমা আছে—এ গল্পে তাহারই প্রকাশ। কালী ঘরামি হইলেও মায়া-মমতায় ও কর্তব্যবোধে মানবতার উদাহরণস্থল।

বিভূতিবাবুর 'রাজু পাঁড়ে' কালী ঘরামির সগোত্র। একটি অর্ধসভ্য অথবা বর্বর আরণ্যক মানুষের কৌতুককর জীবনবৃত্ত। আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে তুচ্ছ মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এই সদানন্দ পুরুষটি মানবতার দুর্লভ গুণে ভূষিত।

'ভাগ্য-বিচার' গল্পে শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় রাজপুত রাজকুমারগণের বিচিত্র জীবন-কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাকে ঠিক ছোটগল্প বলা চলে না—ইহা ঐতিহাসিক রূপকথা। এ কাহিনী কিশোর-চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সনাতনের সংসার-ত্যাগ' গল্পটিও ইতিহাস-মিশ্রিত কাহিনী। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের একটি প্রাণময় অধ্যায়কে ধারণ করিয়া আছেন। বাঙলায় সেদিন প্রাণের জোয়ার আসিয়াছিল—সে জোয়ারে পার্থিব সম্পদ্ তুচ্ছ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। 'সনাতনের সংসার-ত্যাগ' এই কাহিনীরই রূপান্তর। তাঁহার ত্যাগের কাহিনী বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের মতই অপূর্ব।

'ডাক-হরকরা' আমাদের একান্ত পরিচিত মানুষ। তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও তাহার জীবনে তুচ্ছতার দিকটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। তাহার জীবনও যে কৌতূহলোদ্দীপক একথা আমরা ভাবি নাই। রাণার ছুটিয়া চলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির নিশুতি ভঙ্গ করিয়া—

লণ্ঠনের আলোটি বিন্দু হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল। সে চলিয়াছে দূরে মানুষের সুখদুঃখের বোঝা বহন করিয়া। অতঃপর একদিন সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিজের নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মৃত্যুবার্তা বহন করিয়া আনিল। এ হেন মানুষের আশ্চর্য কাহিনী তারাশঙ্করের গল্পে প্রকাশিত। একান্ত বাস্তব ও সত্য, অথচ রূপকথার মতই মনোহর।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে ফুলগাছ যেমন অশ্রান্ত প্রয়াসের দ্বারা তাহার শাখাগ্রে ফুল ফুটাইয়া তুলে, গল্পকার তেমনই সর্বপ্রযত্ন করিয়া একটি মুহূর্তকে সৃষ্টি করেন—মুহূর্তটি চরম এবং এই চরম মুহূর্তে জীবনের পরম ও গভীর সত্যের বিকাশ। ছোটগল্পের রহস্য ইহাই।

সূচীপত্র

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকালতত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি। এই বেলা ওঠ্।"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া-চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ী রূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখন উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—"মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।" গুঁড়ি এক পাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য-গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া, একটা

অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ী কোথায়?"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোথা।" কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা?"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা-বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাব না।"

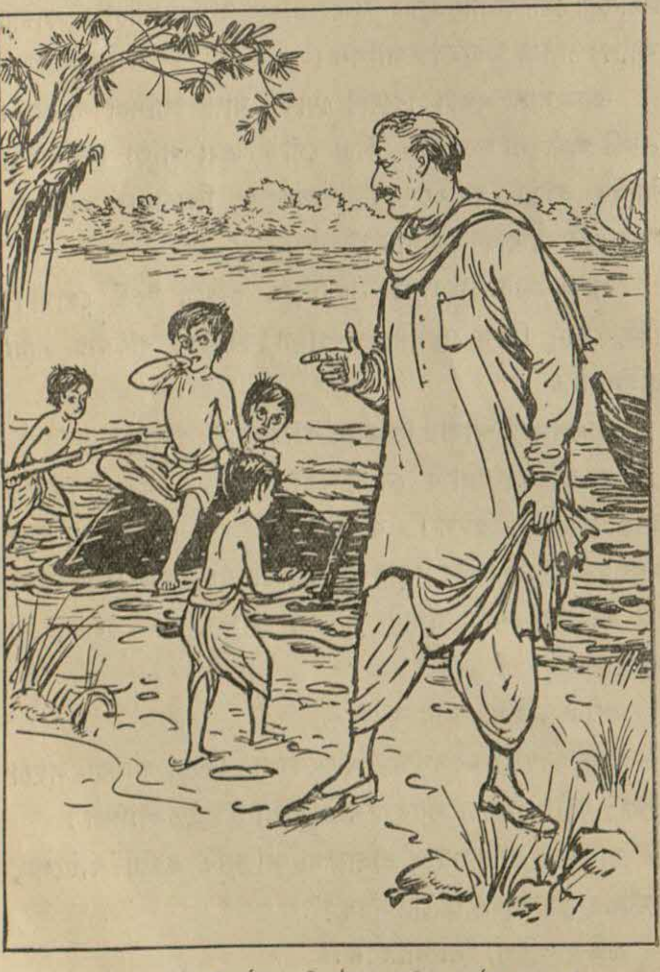
বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস্?"

ফটিক কহিল, "না মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস্?"

"কখখনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"



বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ওই হোথা।'

মাখনকে প্রশ্ন করিতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা!"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস?"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে তোমাদের?"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে?" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পান নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে

ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি ?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল, কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী-একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার নিদ্রা হয় না। অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পূরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ী পৌঁছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার

নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে!

বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা

এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়। অতএব, তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও"—তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস-ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া

উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি-সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিতেন তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়ীগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে যাব ?"

মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।"

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। এক

তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্ সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবেন তাহা, স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে

নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ী আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ী হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখচক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্‌ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, "মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবেই দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে, এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মাণিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "অ্যাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

আদরিণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—“মুখুয্যে-মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধূমধাম হবে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?”

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—“কি রকম ? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম ? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধ’রে তাদের এস্টেটের বাঁধা মোক্তার ?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর ?”

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে বন্ধু-বাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল ; ইহা, যে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিনও ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন,—“না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে-মশায় ? আমরা কি সে ভাবে বলছি ?—জেলার মধ্যে

এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জ যাবেন কি।"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন, বলিলেন,—"ভায়ারা ব'স।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন,—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"যাবার তো খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া তো সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী ক'রে যেতে হ'লে যেতে দু'দিন, আসতে দু'দিন। পাল্‌কি ক'রে যাওয়া—সে-ও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দু'জনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই, মুখুয্যে-মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতীটাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দু'জনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন,—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র তো আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতের আহ্নিক পূজাটা

মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ-কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিত-জনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন জনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কত বার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। ইঁহার হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন, তেমনি তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত গরীবলোকের মোকদ্দমা তিনি কত সময় বিনা 'ফিস্'-এ, এমন কি, নিজে অর্থ ব্যয় পর্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ

অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকীলবাবুও আছেন। হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে, হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাশুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হাতী পাওয়া গেল না।" কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ!—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তাই ত! সব মাটি!"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস্?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে, তার জন্যে হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতে যেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, —"হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—"তার

আর কি করবেন, মুখুয্যে-মশায়। পরের জিনিস, জোর তো নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে নিয়ে, রাত্রি দশটা-এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন,—"না। গোরুর গাড়ীতে চ'ড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চ'ড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

শহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী হাতী আছে,—এখনও বাচ্ছা। বিক্রয় করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত ?"

"দু' হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা ?"

"না, সওয়ারি দিতে পারবে।"

"কুচ পরওয়া নেই। তাই কিন্‌ব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী-মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

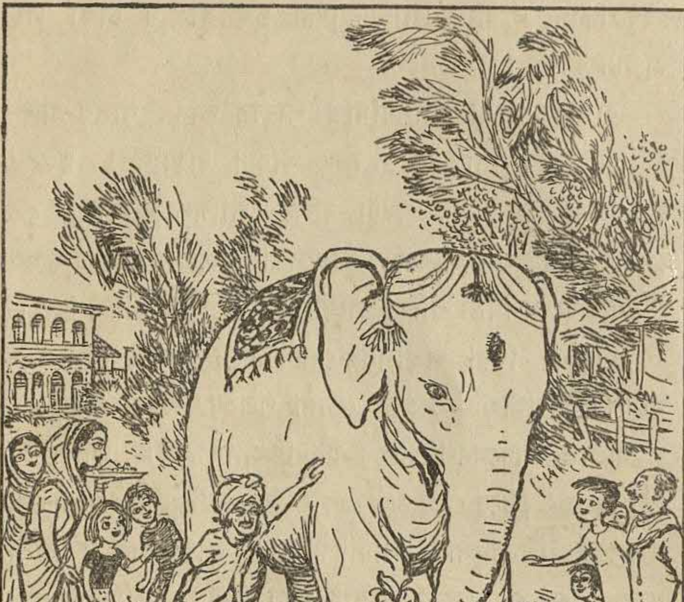
পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্মচারী রীতিমতো

স্ট্যাম্পকাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক-বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটিতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিতহস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় করিয়া আলো-চাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।



একটা ধামায় করিয়া আলো-চাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরের অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়সংক্রান্ত দুইচারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মুখুয্যে মশায়, এ হাতীটি কার?"

মুখুয্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন,—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমার হাতী! কৈ, ও হাতী তো কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তবে যে বল্লেন, আমার হাতী?"

বিনয়ব্যঞ্জক কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন,—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি, আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত

করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি এখন আর কাছারী যান না। ব্যবসায় ছাড়ায় কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। যে পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল, "হাতীটি আর কেন, ওকে বিক্রী ক'রে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় উত্তর দিয়া থাকেন,—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী ক'রে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো কিঞ্চিৎ অর্থাগম

হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তী-ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১ টাকা এবং মাহুতের খোরাকী ॥০ একুনে ৪॥০ ধার্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার)
চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, শহরে প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশি আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫।৭ টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশ-বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে! অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়। কোম্পানীর

কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু তো একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে? এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এক দিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সে-ও ফেল হইয়াছে।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুন-হাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু, বাছুর ঘোড়া, হাতী, উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন,—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হ'য়ে যাবে এখন। দু'হাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"কি ক'রে তোমরা এমন কথা বল্‌ছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন,—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হ'য়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হয়। যে বেশ আদরযত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন,—"তোমরা সবাই যখন বল্‌ছ, তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন

ভাল খদ্দের ঠিক কর,—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।”

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই জমজমাট বেশি। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত তো যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে হস্তিনী ভোজন করিতেছে। বাড়ীর মেয়েরা বালক-বালিকাগণ সজল নেত্রে বাগানে হাতীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন,—“আদ্‌র, যাও মা, বামুন-হাটের মেলা দেখে এস।” প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল-দুঃখে এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল; মুখোপাধ্যায় মহাশয় শূন্যমনে বৈঠক-খানার ফরাস-বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন—স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্নব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভ কার্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয়পক্ষের আশীর্বাদ হইবে। হস্তি-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়। কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্‌মস্‌ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল– কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে।

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বামুন-হাটের মেলা ভাঙিয়া সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুন-হাটে বিক্রীত হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমতো আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল,—"দাদামহাশয়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ, দাদামশায়! যাবার সময় চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগ্ল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"জানতে পেরেছে। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর ক'রে? না, না, তা নয়। তুই কি আমার মনের কথা বুঝ্তে পারিস নি?—খুকীর বিয়েটা হ'য়ে যাক। তারপর তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব, রসগোল্লা নিয়ে যাব, যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

পরদিন বিকালে একটি চাষী লোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিল। পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যম পুত্র লিখিয়াছে, "বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে

কাতরস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই —বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার শব-দেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটি জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।”

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মতো পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—“আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছট্‌ফট্ করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হ'বে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।”—তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ! বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শব-দেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—“অভিমান ক'রে চ'লে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম ব'লে—তুই অভিমান ক'রে চ'লে গেলি?”

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

ভাগ্য-বিচার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড়; তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন; মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে আর গুহার সাম্‌নে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যা-বেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে! সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সূরজমল ব'লে উঠলেন, "কেমন, বলেছিলেম তো কপাল ফোঁপরা। মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি ক'রে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল।" পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পরে হাত গুণিয়ে তবে ছুটি!" একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ ক'রে শব্দ ক'রেই চুপ করলে। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপরে মাটিতে, আর সূরজমল বসলেন একটা হাঁটু

বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর-সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন, চার মূর্তি! সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার ক'রে বসলেন। সূরজমলকে আর উঠতে হল না—তিনি যে মাটিতে বসে ছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতদুটো একটু কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে-বসেই বল্‌লে, "মাতাজী, গণনা ক'রে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা র'য়েছে।"

সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালেই হাত বোলাতে লাগলেন, আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন, দেখে পৃথ্বীরাজ ব'লে উঠলেন—"ভাবেন কি? বড় জরুরী কথা! বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে গণনা ক'রে উত্তর দেবেন।" সঙ্গ বল্‌লেন, "আগে চারণীর পূজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ও-সব ক'য়ো।" "সেই ভালো" বলে সিদ্ধিকরী পূজোয় বসলেন; চারণীর সাম্‌নে একবার প্রদীপ নেড়ে ঘন্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চার রাজপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন, "রাজকুমারেরা, একটা ইতিহাস বলি শোন—

পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য

রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ কর্‌তে বস্‌বেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ কর্‌তে কর্‌তে সেখানে উপস্থিত। মহারাজ তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বল্‌লেন, 'দেবি, আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুজনেই রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার কর দেখি আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়!' বীণা-হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বল্‌লেন, 'আমি বড়, না ও বড়?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বল্‌লেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়?' রাজা দেখেন বড় গোলযোগ—এঁকে বড় করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন!

রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোট রাণী ব'লে উঠলেন—'ঠাকরুণরা, রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার ক'রে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কি ক'রে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক কর্‌তে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হ'য়ে যাবে দেখবেন!' রাজা বল্‌লেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' ব'লে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে ব'সে ছোটরাণীকে বল্‌লেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে, কিন্তু কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রাণী ভিরকুটি ক'রে বল্‌লেন, 'বিচারের আমি কি জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী; তাঁদের শুধোও না।' রাজা মাথা চুল্‌কে সভায় প্রস্থান করলেন।

সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুল্‌কোতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুইপ্রহর বাজ্‌ল কিছুই মীমাংসা হ'ল না, দুই দেবীর বিচার কি হিসেবে করা যায়? সরস্বতীকে বড় বল্‌লে চটেন লক্ষ্মী, রাজপাট সব যায়, নবরত্নেরও মাসহারা বন্ধ হয়। আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোট, লক্ষ্মীই বড়, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা-লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি-পুঁথি খনার বচন সবই মাটি! রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হ'য়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রাণী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবলি এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তারপর"—

এমন সময় পৃথ্বীরাজ ব'লে উঠলেন—"ও গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রূপোর খাটে; ছোটবড় বিচার আপনিই হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার ক'রে আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?"

সিদ্ধিকরী একবার চার জনের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "রাজকুমার, তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার শেষ ক'রে ব'সে আছ। সঙ্গ—যিনি ব'সে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন, তিনিই রাজ্যেশ্বর। সূরজমল ব'সেছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে

জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন—হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় বড় জমিদার! আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা ব'সেছ—সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই!"

এই কথা ব'লেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চ'লে গেলেন; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট ক'রে এর ওর দিকে চাইতে থাকল! সর্বপ্রথম সূরজমল কথা বল্‌লেন,—"তা-হ'লে?" "তা-হ'লে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হ'য়ে যাক আজই।" ব'লেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাহিরে যাবেন, তলোয়ারের চোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণী দেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘট্‌ল! সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। এক দিকে গেলেন সূরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে—এর পিছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি! অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় একরাতের পথে রাঠোরসর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরণে কাঁচামাটির দেওয়ালঘেরা খামার বাড়ী। রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ "রক্ষা কর" ব'লে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই ব'লে উঠলেন, "একি! এমন দশা আপনার কে করলে?" সঙ্গ দু-কথায় তাকে বুঝিয়ে



"তা-হ'লে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হ'য়ে যাক আজই!" ব'লেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন।

দিলেন—প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সূরজমল দু'জনেই অজ্ঞান হ'য়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন, কিন্তু জয়মল এখনও পিছনে তাড়া ক'রে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বল্‌লে, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।" ওদিকে জয়মল আসছেন, একটা ঝড়ের মতো—মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছে তখনি তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ্ ক্রমে এগিয়ে আসছে। সঙ্গ ইতস্ততঃ করছেন দেখে বিদা বল্‌লে, "কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম ক'রে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হ'তে হবে না, আমি তাঁকে ঠেকিয়ে রাখব।" তাই হ'ল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূবমুখে অনেক দূরে ছোট একটি কালো কোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সঙ্গ চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন—তারপর ঘাড় নীচু ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হ'য়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষাণরা সকালে ক্ষেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সূরজমল আর পৃথ্বীরাজ ! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারাণার লোকজনও—তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে, ঘোড়া পাল্‌কি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে; কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সূরজমল দু-জনকে তারা সন্ধান ক'রে ফিরে পেলে, আর দু-জন যে কোথায়, তার আর খবরই হ'ল না। পৃথ্বীরাজ রাণীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সূরজমলের চোট বেশি, অনেক তদ্‌বিরে তিনি সুস্থ হ'লেন। মহারাণা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বল্‌লেন, "এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথাও লুকিয়ে আছে। মনে ক'রো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর, আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই যদি চাও তো বড়-ভায়ের সঙ্গে না ল'ড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করগে, তবে বুঝব তুমি বীর—যাও।"

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সূরজমলকে রাণা ডেকে বল্‌লেন, "তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে বেশি শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের

ওখানে গিয়ে থাক, চিতোর-মুখো হ'য়ো না।" সূরজমল তো নির্বাসনে গেলেন! এখন পৃথ্বীরাজ বা'র হলেন চিতোর ছেড়ে দিগ্‌বিজয়ে। তিনি জানতেন মহারাণার কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন ক'রে তবে। রাণা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যি ভালোই বাস্‌ত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হ'ল না। দু-একজন ক'রে ক্রমে একটি ছোট খাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হ'ল এখানে-ওখানে লড়াই ক'রে বেড়ানো।

রাজস্থানের মীনারা—জংলী, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন কর্‌ছে। মহারাণাকেও সে তুচ্ছ করে; নদালা ব'লে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন; সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হ'য়ে শিকার, বনভোজন—এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়-বড় মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ কর্‌ছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ ক'রে তাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকী রইল, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময়ে বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং

পাঠানদের উৎপাতে রাজ্য-সম্পদ্ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমাসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারাণার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে কর্‌তে চায়, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে কর্‌বেন।

জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা। জয়মল টোডা-রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির ক'রে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্‌টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন।

শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপি-চুপি শূরতানের অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হ'লেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশি দূর যেতে হ'ল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা প'ড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধ'রে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হ'ল না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত ধ'রে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না। এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে

দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মত তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ ক'রে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূঁয়ে নামিয়ে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিলেন রীতিমত।

জয়মল মহারাণার ছেলে; আর শূরতান রাজা হ'লেও এখন মহারাণার আশ্রিত; কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছুল, তখন সবাই ভাবলে এইবার শূরতান গেলেন। কিন্তু মহারাণা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বল্‌লেন, "জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার! কোন্ বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও, শূরতানকে বল গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।"

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হ'লেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে সমানে মিল্‌ল। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লে বিয়ে হবার উপায় নেই! পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ কর্‌লেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার কর্‌বেনই; আর সেইদিনই তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হ'লেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ

সঙ্গী আর অনেক পিছনে চল্‌লেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডা-শহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক—নিশেন আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, তুল্‌তুল্‌, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মস্‌জিদের ছাদে উঠে তামাসা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়ার সঙ্গে হাসন-হোসন কর্‌তে-কর্‌তে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন তুজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে। আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখ্‌তে হ'ল না ; ভিড়ের মধ্য থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল—আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উল্‌টে পড়লেন ; সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল—মুসলমানদের সঙ্গে। সকাল বেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল ক'রে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারাণার কাছে পৌঁছুল। এইবার প্রাণ গল্‌ল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ—ছেলের মত ছেলে। মহারাণা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় তুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাণার আত্মীয় সারংদেব আর সূরজমল তুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ

তখন অনেক দূরে—কমলমীরে; সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল—মহারাণা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সূরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধ্‌ল। রাজার ফৌজ ক্রমেই হঠ্‌তে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্ত্রের ঘা খেয়ে মহারাণা দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন, সূরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেদিনের মত স্থগিত রইল। দুই দলের লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম কর্‌ছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল ধুনি জ্বলছে; সারাদিনের পর সূরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘা-গুলো ধুয়ে পুঁছে পটি বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাম্‌নে পৃথ্বীরাজকে দেখে সূরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধ'রে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "ভয় নেই; কেমন আছ তাই জানতে এলেন।" সূরজমল একটু হেসে বল্‌লেন, "হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেম। যা হোক, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হ'লেম। মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?" পৃথ্বীরাজও হেসে বল্‌লেন, "কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে আসছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।" এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হ'ল।

সূরজমল বল্‌লেন, "আরে দেখচিস্‌নে কে এসেছে! যা দৌড়ে আর এক থাল নিয়ে আয়।" দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সূরজমল বল্‌লেন, "বুঝেছি, সারংদেব এই এক থালা বই আর কিছু পাঠায়নি; খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।" শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল। বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বল্‌লেন, "আমাদের পুরনো ঝগড়াটা তা-হ'লে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল?" সূরজমল হেসে বল্‌লেন, "বেশ, আজকের মত একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব, জেন।"

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সূরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চল্‌লেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চল্‌লেন—একটার পর একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাতে থেকে আবার জয় করতে-কর্‌তে। শেষে সূরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না, সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল ক'রে নিলেন। সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে দেউলগড়ে, সূরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরবার সময় পেলেন; তাঁর কপালের লিখন এমনি ক'রে ফল্‌ল।

জয়মল, সূরজমল, ছু'জনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে স'রে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ; একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে—সঙ্গ বেঁচে আছেন; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ

হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনি নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ কর্‌তে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও ব'সে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধর্‌বার জন্যে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হ'ল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধর্‌বার জন্যে বা'র হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে তাঁর ছোটবোনের এক পত্র পেলেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হ'য়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান কর্‌ছে, লাথি মারছে, ঘরের বা'র ক'রে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাঁর ছোটবোন মারা যাবে। ছোটবোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি প'ড়ে,—পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে—কিন্তু যাওয়া হ'ল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহির মুখে—বোনকে রক্ষা ক'র্‌তে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চল্‌ল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক্ থেকে ঠিক উল্‌টো মুখে—অনেক দূরে।

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় প'ড়ে রাণার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রাণার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহির রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহির রাজাটাকে ভূঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রাণার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধ'রে বল্‌লেন, "দাদা থাম, প্রাণে মের না।" পৃথ্বীরাজ রেগে বল্‌লেন, "এত বড় ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে! জানে না, তুই মহারাণার মেয়ে কুকুরের মতো চাবুক

মেরে সিধে কর্‌তে হয়!" শিরোহিরাজের তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বল্‌লে, "এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা কর।" পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধ'রে দাঁড় করিয়ে বল্‌লেন, "নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় ক'রে ওর কাছে ক্ষমা চা—তবে রক্ষে পাবি।" "একথা আগে বল্‌লেই হ'ত," ব'লে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রাণী বল্‌লেন, "থাক্ এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।"

রাণার জামাই খুব খাতির ক'রে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহির খাসা-নাড়ু গুটিকতক জল-খেতে দিলেন। শিরোহির খাসা-নাড়ু—অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর পৌঁছুতে হল না; শিরোহির মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচূরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল—জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তার ধূলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারাণী একা রয়েছেন সেই দিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় ব'সে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে "ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।"

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না ;—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র প'ড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের স্থমুখে ; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন ; যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত ছুপুরে পেত,—ধোঁয়ার মত যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মত যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পূজোর আঙ্গিনা—যে আঙ্গিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দার, তার সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কি চেহারা তার ! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁপ-ছাঁটা। সে ছিল ওদিকের সব-চেয়ে সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর

পাটনিকে এক হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে, কোন লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম ক'রলে ও না ব'লতে পারবে না, কারণ, ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।”

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস,—চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, “আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।”

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, “হুজুর, লেঠেলি আমার জাত্-ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মত—আমিও খেয়ার নৌকা পারাপার ক'রেই দু'-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠিখেলা নয়, লগিঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “তা হ'লে তুমি লাঠি খেলতে জানো না?”

সে উত্তর করলে, “হুজুর, জানতুম ছোকরা বয়সে। তারপর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি;—তা ছাড়া—আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি ক'রে? হুজুরের হুকুম হ'লে,

আমি না বলতে পারিনে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে ?"

ঈশ্বর বল্‌লে, "ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখতো। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হ'য়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনও মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারি গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হুজুর, আমি তন্তর-মন্তর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল, তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি-সড়কির মার কোন্ দিক্ থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না, আর শুধু মার খেত। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে। তারপর, একদিন এরা রাত তুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হ'য়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবার উদ্‌যোগ কর্‌লে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বল্‌লে,—তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি কর যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব। হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি এই দিব্যি করেছি; আর তারপর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁইনি।

কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।”

মিছু আমাদের বাড়ীর লেঠেলদের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, “ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে ?” সে ‘হাঁ’ ‘না’—কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর ব’লে উঠল, “হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলিনি—আর, কখনো বল্‌বও না।”

তারপর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, “মিছু যদি গুলিখোর হয় তো এমন পাকা লেঠেল হ’ল কি ক’রে ?”

ঈশ্বর বল্‌লে, “হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না ? ঠাকুরদাস কামার অত বড় মোষটার মাথা এককোপে বেমালুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করিনে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন তো ক’মে এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয়—তা হ’লে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।”

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম—তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ ক’রে বল্‌লে, “আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মত অনুমতি দিচ্চি। দেখা যাক, ও কি ছেলে-খেলা করে।”

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তু’লে বুকে বাঁধলে ; আর তার ঝাঁকড়া চুল, একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘ’সে

ফুলিয়ে তুললে, তারপর মাটিতে জোড়াসন হ'য়ে ব'সে, পাঁচ মিনিট ধ'রে বিড় বিড় ক'রে কি ব'কতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে—আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।" ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও কর্‌লে না। তারপর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।

ঈশ্বর বল্‌লে, "প্রথম এক হাত লকড়ি নিয়েই ছেলে-খেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দার বল্‌লে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক হাত খেলে, তাকে যদি হারাতে পার, তা হ'লে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কাকে বলে, তা দেখাব।" তার পরে একটি বছর কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি ; বাঁ হাতে ছোট্ট একটি বেতের ঢাল আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লকড়ি। খেলা সুরু হ'ল ; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি—কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হ'য়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বল্‌লে, "যে লকড়ি হাতে ধ'রে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি ?"

এ কথা শুনে—মনিরুদ্দি রেগে আগুন হ'য়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বল্‌লে, "তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।"



তারপর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।

এর পরে পাঁচ মিনিট ধ'রে ছু'জনের লকড়ি বিছ্যুদ্‌বেগে চলাফেরা কর্‌তে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি—মনিরুদ্দির সর্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হ'য়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদূর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "ধর্ বেটা সড়কি।" ঈশ্বর বল্‌লে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিও না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ তো কাজিয়ে নয়—আপোসে খেলা। আর এই কথা মনে রেখ, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তেমনি তোমার গায়েও আছে।" এর পর সড়কির খেলা সুরু হ'ল। সড়কির সাপের জিভের মত ছোট ছোট ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কি রকম করে, কারণ, সড়কির ফলা তো সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে প'ড়ে। ঈশ্বর বল্‌লে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার ক'রে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা হ'লে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম কর্‌তে, নয় খুন কর্‌তে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চ'ড়ে গেল,

আর সমস্বরে—'মার্ বেটাকে' ব'লে চীৎকার ক'রে তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ কর্‌লে। ঈশ্বর একখানা বড় লাঠি দু'হাতে ধ'রে আত্মরক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দু'জনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা কর্‌তে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে, আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হ'য়েছিল। কারও কারও মাথাও ফেটে গিয়েছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বল্‌লে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারিনি। ওদের গায়ে মাথায় যে দাগ দেখছেন সে সব ওদের লাঠিরই দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় প'ড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠি-বৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বল্‌লে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম ও বেটা যাদু জানে, এখন তো দেখলেন যে আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে লাঠি সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম—লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠি খেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা, সাহিত্যের খেলাতে,

পলিটিক্সের খেলাতে—তিনিই দিগ্বিজয়ী হন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই, তাঁরা তা জানেন না। আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

জমিদারের ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর-বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধূঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।



ওটা হচ্ছে কি শুনি ? এ হিঁদুর গাঁ,

ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ?

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস্‌?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখ্‌চি তেম্‌নি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হ'লে যে কত্তা তোকে জ্যান্তে কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দুখুটো খাইয়ে আন্‌ব—তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি—খামারে প'ড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠের আলগুলো সব জ্ব'লে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই, কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ তো ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না, ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা, খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি কর্‌লি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? ব্যাটা কসাই।

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কত্তামশায় সব ধ'রে রাখ্‌লেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে প'ড়ে বল্‌লাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটীতে থাকি, তাও না হয়

তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হ'য়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই—খেয়ে রেখেছিস্, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা রামরাজত্বে বাস করিস্—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে ক'রে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কর্‌ব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটীতে দুবেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি-বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোণা যাচ্ছে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দুদিন পেট পূরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

তর্করত্ন তীরবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্—ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি ?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবোলা জীব—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি ক'রে শুনি ?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না। যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো !······যা যা সর্, পথ ছাড়্। ঘরে যাই, বেলা হ'য়ে গেল ! এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি ?

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায় ? তা বটে ! যেমন চাষা তার তেম্‌নি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই। নে-নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখ্‌চি কাকে খুন্ করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেট পূরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই তো জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর রগ্‌ড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গো-চরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি ক'রে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই গাদা ফেড়ে খাবি, লোকের কলাগাছে মুখ দিদি—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে

ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগ্‌গির ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা ?

কেন মা ?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর থেকে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা ?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝ'রে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কর্‌চ ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে ? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে ?

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই ম'রে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিধে পেয়েচে?

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হ'লে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে, আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যে চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের-বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি

প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি!

হাঁ বাবা, সত্যি! তাদের চাকর বল্‌লে, তোর বাপ্‌কে বল্ গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে, বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে প'ড়ে এল বাবা, মহেশকে আন্‌তে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বল্‌লে তিন দিন হ'লেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌বে ?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না। কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত, ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটা বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়েক মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাব্‌লাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়াগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড়ো করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙ্‌ব না, এই পূরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গোরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি—খবরদার বল্‌চি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি ! আমার জিনিস আমি বেচ্‌ব না—আমার খুসি। বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে ?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে ? বলিয়া সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত ? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না ?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো ?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি ? চাম্‌ড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি ?

তোবা ! তোবা ! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ বিশ্রী একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের

ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়া ছিল, শিবুবাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস ক'রে আছিস্, জানিস্?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদ-মেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কর্‌ব না কর্তা! বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখৎ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস্ নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং

যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্ন-চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, এ কথা আজ ভাবিতেই পারা যায় না। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন

চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল—আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বল্‌লি—হয় নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস্ নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল্ থাক্‌বে কি ক'রে? রোগা বাপ খাক্ আর না খাক্, বুড়োমেয়ে চারবার পাঁচবার ক'রে ভাত গিল্‌বি! এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ ক'রে বাইরে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই!

আমিনা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই,

তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস্ কি? এত লোকে মরে তুই মরিস্ নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো অবধি তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেম্নি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেম্নি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে

কেহ তাহার মেয়েকে কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এম্‌নিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্‌?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাক্‌চেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয় নি, পরে যাবো।

এত বড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণ কণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং

জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে ম'রে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়েক মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথার উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা ?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ কর্‌তে।

মেয়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহু বার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্ নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁট্‌তে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ ক'রো না।

কালী ঘরামি

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

পূর্বে জাহানাবাদ, রায়না প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাষবাসের অবসরকালে সদ্‌গোপ, আগুরী, বাগদী প্রভৃতি লোকেরা কলিকাতার নিকটবর্তী ও গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামগুলিতে মজুরির জন্য আসিত এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের আশ্রয়ে তাহাদের বহির্বাটীতে থাকিয়া, কেহ ঘরামির কাজ, কেহ মুটের কাজ, কেহ রেড়ির কলে কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করিত। যে ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ে থাকিত, তাহারা একপ্রকার সেই পরিবার-ভুক্তই হইয়া যাইত। তাহাদের পুত্রাদিরাও আসিয়া সেই পরিবারেরই আশ্রয় পাইত। গৃহকর্তাকে বাবা, গৃহকর্ত্রীকে মা, কাহাকেও খুড়ীমা, কাহাকেও বউঠাকরুণ, কাহাকেও জ্যাঠা-মশায়, কাহাকেও খুড়া-মশায়, কাহাকেও দাদা-মশায় প্রভৃতি সম্বোধনে তাহারা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া গৃহস্বামীর সুখ-দুঃখের সমভাগী হইয়া পড়িত। কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিত্য সন্ধ্যার পর গিন্নীমার নিকট উপার্জনের পয়সাগুলি রাখিয়া দিত; দেশে ফিরিবার সময় তিনি সেগুলি তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন। কার্য হইতে অবসর পাইলেই তাহারা আশ্রয়দাতার গো-সেবা,

জলতোলা, তামাক সাজা, বহির্বাটী পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্য আপন ইচ্ছাতেই করিত; এবং তাহাদের নিকট বসিয়া গল্পাদি শুনিয়া ও করিয়া আনন্দ পাইত। বিপদ-আপদে বা ক্রিয়াকর্মের সময় গৃহকর্তাকে কখনও লোকাভাব বোধ করিতে হইত না। তাহারা থাকায় গ্রামে মুটে-মজুরের তো অভাব ছিলই না, তদ্ব্যতীত কাহারও গোরু-বাছুর মরিলে বা অন্য কোন আবশ্যক হইলে, কাহাকেও চিন্তায় বা বিপদে পড়িতে হইত না। ফল কথা, তাহারা সমগ্র গ্রামেরই পরিজনমধ্যে পরিগণিত হইত।

এখনও কাহারও কাহারও পুত্র-পৌত্রাদি সেইভাবেই আসে বটে, কিন্তু পূর্বের সেই প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক আর নাই; এখন আশ্রয়দাতারা বড়বাবু, ছোটবাবু হইয়াছেন এবং আশ্রিতেরা ছোটলোক, ঘরামি প্রভৃতি হইয়াছে। আশ্রয়দাতারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া উপকার করিতেছেন ভাবেন এবং তৎপরিবর্তে বাড়ীর কাজগুলা প্রাপ্য হিসাবে জবরদস্তিতে চোখ রাঙাইয়া আদায় করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন, কাজেই তাহারাও এখন ক্রমশ দল বাঁধিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র বাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; বিপদ-আপদে আবশ্যক পড়িলে অনেক হাঁটাহাঁটির পর তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় এবং পয়সা না ফেলিলে কোন কাজই পাওয়া যায় না।

সীতারাম ঘরামি তাহার পুত্র কালীকে একবার সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে আনিয়াছিল। কালীর বয়ঃক্রম তখন ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সেই বয়সেই সে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের বাটীর সকলের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাধ্যতা, বিনয় ও কর্তব্যনিষ্ঠায়, মাত্র তিন মাস অবস্থিতিকাল মধ্যে, সে সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল।

সে আজ সাত বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে সীতারাম কালীকে আর সঙ্গে আনে নাই, একাই আসিত, তজ্জন্য প্রতিবারেই বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের বাটীর সকলেই ক্ষুণ্ণ হইতেন; গ্রামের অন্যান্য লোকেও কালীর সংবাদ লইত। সীতারামের বয়স হওয়ায় এবং শরীর সুস্থ না থাকায়, এবার সে কালীকে পাঠাইয়াছে। কালী এখন কুড়ি বৎসরের যুবা,—চক্ষু দুইটি শান্ত ধীর, বদনে যেন বিনয়ের ও দাস্যের একটা সুন্দর আভাস বর্তমান।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় কালী যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া কর্তা ও গৃহিণীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া, এক পার্শ্বে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, তখন "এস বাবা, এস, এতদিন কি আমাদের ভুলে থাকতে হয় বাবা?" বলিয়া গৃহকর্ত্রী তাহার মস্তকে স্নেহ-হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বোধ হইল যেন, তাঁহারা বহুদিনের পর তাঁহাদের হারা পুত্র ঘরে পাইলেন। বাড়ীর সকলের আনন্দ দেখে কে, প্রতিবেশীরাও আসিয়া সে আনন্দে যোগ দিল। তাহার পর "সীতারাম কেন এল না, সে কেমন আছে, মা কেমন আছে, ভায়েরা কেমন আছে, ধান কেমন হয়েছে, আমাদের জন্যে কি আনলে?" প্রভৃতি প্রশ্নের আর সীমা রহিল না। গৃহকর্ত্রী সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন,

"ও-সব এর পর হবে এখন, বাছার মুখ শুকিয়ে গেছে, আগে খাওয়া-দাওয়া হোক। কালী, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আগে কিছু খা বাবা।" কালী ধীরভাবে বলিল, "মা, আগে আমি গঙ্গাস্নানটা ক'রে আসি, আমার দেরি হবে না।"

তাহার পর কালী বহির্বাটীতে সীতারামের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাহা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিল এবং আপনার পিতলের ঘটি ও ছোট বড় দুইখানি কাটারি, তেল রাখিবার বাঁশের চোঙা, একখানি কাঁথা, একখানি মোটা চাদর ও একখানি আট-হাতি কাপড় এবং একখানি ছেঁড়া রামায়ণ গুছাইয়া রাখিল। কিছু সোনামুগের দাল ও পাটালি গুড় আনিয়াছিল, তাহা গিন্নীমাকে দিয়া এবং গেঁজেতে যে দশ আনা পয়সা ছিল, তাহা তাঁহার কাছে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গেল।

মা সেই সোনামুগের দাল ও পাটালি গুড় বহুমূল্য বস্তুর ন্যায়, মহা সমাদরে কালীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন।

২

দুই-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে, এখন কালী তাহার কাজ-কর্ম বুঝিয়া লইয়াছে এবং একটা নিত্য-কর্মের পদ্ধতিও ঠিক করিয়াছে। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ভঁগবানের নাম করে; তাহার পর বহির্বাটী মার্জনা করে। পরে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া গোরু-বাছুরগুলিকে জাব দিয়া এবং কর্তার জন্য এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রাখিয়া, দা-খানি লইয়া ঘরামির কাজে যায়। বেলা বারোটার সময় ফিরিয়া আসিয়া গিন্নীমার

নিকট গঙ্গাজলের ঘড়া চাহিয়া লইয়া স্নানে যায়। স্নানান্তে স্বয়ং এক ঘটি গঙ্গাজল ও একখানি কলাপাত কাটিয়া লইয়া, কোন এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া আসে। সকলে তাহার গুণে ও শিষ্টতায় এত মুগ্ধ ছিল যে, মাসের মধ্যে প্রত্যেক দিনই এক এক বাড়ীতে তাহাকে প্রসাদ পাইতে হইত। কর্তা কিন্তু চারিটি রবিবার তাহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন।

দুইটা বাজিলেই কালী আবার কাজে যাইত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিত। পরে, প্রদীপ জ্বালিয়া বিচালি কাটিতে বসিত এবং জাব দিয়া সংসারের আবশ্যকমত জল তুলিয়া দিত। তাহার পর কর্তার নিকট বসিয়া তাঁহার তামাক সাজিত ও তাঁহার নিকট গল্পাদি শুনিত। পৌরাণিক গল্পাদি শুনিবার জন্য সে উন্মুখ হইয়া থাকিত। সকলের আহার হইলে সে গিন্নীমার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রসাদ পাইত। পরে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সেই জীর্ণ রামায়ণখানি পড়িত ও চক্ষের জল মুছিত। বারোটা বাজিলেই শয়ন করিত।

৩

শ্রাবণ মাস, আকাশে মেঘ আর ধরে না, বৃষ্টিরও বিরাম নাই। বৃক্ষ ও গুল্মলতাদির প্রাবল্যে এবং তাহাদের জলভারাক্রান্ত শাখা ও পত্রের অবনত-প্রসারে, ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন ঢাকা পড়িবার মত হইয়াছে। উপরে মেঘগর্জন এবং নিম্নে ভেকের আনন্দ-ধ্বনি, যেন বর্ষার বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

নিদাঘ-নিপীড়িত পুষ্করিণীর ও পথপার্শ্বস্থ চিরাবদ্ধ পয়ঃপ্রণালী-গুলির মলিন জলাবশিষ্ট, আজ তাহাদের সমগ্র মলিনতা ও দুর্গন্ধ ধুইয়া, পুষ্প-পরিশোভিত যৌবন-শোভা কূল ছাপাইয়া লোক-নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছে।

ভট্টাচার্য পাড়ার রাস্তাটি পল্লীর মধ্যস্থল দিয়া যাওয়ায়, গ্রাম্য বধূদেরও সেই পথটি ব্যবহার করিতে হয়। বর্ষার জল-নিকাশের অন্য উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, তখনকার মাতব্বর পল্লীপতিরা ঐ পথের মধ্যস্থলে নালা কাটিয়া, উভয় পার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর যোগসাধনটাই সুবিধাজনক ভাবিয়াছিলেন। অবশ্য, এটা ভাবেন নাই যে, স্ত্রীলোকদের পক্ষে, বৃদ্ধের পক্ষে, অশক্তের পক্ষে অথবা ঐ হেঁয়ালিটি যিনি অপরিজ্ঞাত তাঁহার পক্ষে উহা বিপজ্জনক। যাহা হউক, ঐ ব্যবস্থাই আজ দশ-বারো বৎসর গ্রামের বুকের উপর স্থির-প্রতিষ্ঠ থাকিয়া, পল্লীপতিদের অটলত্ব ও স্থিরপ্রজ্ঞত্ব প্রমাণ করিতেছিল। উহা কত লোকের কত ক্লেশের ও ক্ষতির, এমন কি কত অনিষ্টের কারণ, তাহা বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইলেও, তাঁহাদের জড়ত্ব বিনাশের কারণ হইতে পারে নাই।

চব্বিশ ঘণ্টাই বৃষ্টি চলিয়াছে, আজ আর সূর্যের মুখ দেখা যায় নাই। পথেও লোক-চলাচল কম। কেবল রায়েদের নব বধূটি বৈকালে এক কলস জল লইয়া ভট্টাচার্যপাড়ার পথ দিয়া গৃহমুখে চলিয়াছেন, এবং কালীও তাঁহার প্রায় একরশি পশ্চাতে একখানি কাটারি হাতে করিয়া আপন মনে কাজে চলিয়াছে।

হঠাৎ একটা শব্দ হওয়ায় এবং পরক্ষণেই, কাতরকণ্ঠে কেহ

"মাগো" বলায় কালীর চমক ভাঙিল। সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, আমাদের সেই পরিচিত খানাটিতে অর্থাৎ গ্রামের মুরুব্বীদিগের সেই কীর্তিকুণ্ডটিতে, একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া গিয়াছেন এবং বামপদটিতে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। তিনি দুই হাতে বাঁ পা-টি টিপিয়া ধরিয়া সেই বেদনা সহ্য করিতেছেন।

কালীর অনেক অনুনয়ে তরুণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া কথা কহিলেন; কালী বুঝিল, তিনি কাঁদিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁ পা-টায় বড্ড বেশি লেগেছে, উঠতে পারবেন না?" বধূটি বলিলেন, "বড্ড কন-কন করছে, বোধ হয় আস্তে আস্তে চলতে পারি। কিন্তু খানার ভিতর থেকে উপরে উঠতে পারব কি না জানি না।" কালী বড়ই কাতর হইয়া বলিল, "মা, আমি আপনার ছেলে, আমার হাত দুটোয় ভর দিয়ে উঠুন।" তরুণীর তাহা ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না; একটু ইতস্ততের পর তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল।

কালী বলিল, "এইবার ধীরে ধীরে বাড়ী যান।" বধূটিকে জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কালী আবার বলিল, "চলতে পারবেন না কি?" তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, "কলসী ভেঙে ফেলেছি, আমার যে আজ অদেষ্টে কি আছে!" শুনিয়া কালীর প্রাণটা বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার আসন্ন ভবিষ্যৎটা বুঝিয়া লইতে কালীর আর বিলম্ব হইল না, সে বলিল, "মা, কাপড়খানায় কাদা লেগেছে, ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলুন—আমি এলুম বলে।"

কালী কুমারবাড়ী হইতে একটি কলস লইয়া তাহা জলপূর্ণ

করিয়া আনিয়া অবিলম্বেই উপস্থিত হইল এবং তরুণীকে বলিল, "মা, এইবার আপনি চলুন, আমি আপনাদের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে কলসটি আপনার কাছে দেব।" বধূটি বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং অস্পষ্টভাবে বলিলেন, "এর পয়সা কি করে দেব?" কালী বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মা, আমি ঘরামির কাজ করি, আমাদের কি পয়সা লাগে, আমি কলসীটা অমনি এনেছি, আপনি ওর তরে ভাববেন না, আর ছেলের কাছে মার কি কোন দাবি নেই?" তরুণীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন উপায়ই ছিল না, তিনি একবার কালীর দিকে নীরবে চাহিলেন মাত্র, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বধূটির অবস্থা বুঝিয়া কালীর চক্ষুও অসিক্ত ছিল না।

রায় মহাশয়দের বাড়ীর সন্নিকটবর্তী হইয়া, কালী কলসীটি নামাইয়া দিয়া, তরুণীকে প্রণাম করিয়া, বড়ই অন্যমনস্কভাবে কাজে চলিয়া গেল। বধূটি কৃতজ্ঞনেত্রে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে মনে মনে ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া অতি কষ্টে কলসীটি কক্ষে তুলিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৪

আজ কাজ হইতে ফিরিবার সময় কালী এক বোঝা লম্বা লম্বা কাঁচা কঞ্চি মাথায় করিয়া ফিরিল। সন্ধ্যার পর কর্তাকে তামাক দিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প বা ধর্মকথাদি শুনিবার সময়, ছোট কাটারিখানির সাহায্যে সেই কঞ্চিগুলিকে চারখান

করিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া রাখিল। আহারাদির পর রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়া ঝুড়ি বুনিতে বসিল। সেদিন দুই ঘণ্টায় তিনটি ঝুড়ি বুনিয়া শয়ন করিল। পরদিন হইতে কালী যখনই একটু অবকাশ পাইত, ঝুড়ি বুনিত। তাহার নিত্য-কর্মের তালিকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ক্রমে প্রত্যহ ছয়টি করিয়া ঝুড়ি বুনিতে আরম্ভ করিল।

দক্ষিণেশ্বর হইতে রাজারহাট প্রায় দেড় ক্রোশ পথ। কালী সপ্তাহে একদিন করিয়া রাজারহাটে গিয়া টাকায় বারোটি করিয়া ঝুড়ি বেচিয়া আসিত। প্রথম দিনের ঝুড়ি বিক্রয়ের পয়সা গিন্নীমার কাছে দিবার সময় বলিল, "মা, এ পয়সার জন্যে একটা আলাদা হাঁড়ি ক'রো, এ আমার মজুরির পয়সা নয়,—ঝুড়ি-বেচা পয়সা।" গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, "আমি যে হাঁড়িতে পয়সা রাখি, তা তুই কি করে জানলি কালী ?"

সত্য সত্যই কর্ত্রীঠাকুরাণীর সিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হাঁড়ি থাকিত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের টাকা-পয়সা থাকিত। তিনি স্বয়ং পয়সা গণিতে জানিতেন না, কাহারও কিছু আবশ্যক হইলে হাঁড়ি বাহির করিয়া দিতেন, এবং তাহা হইতে লইতে বলিতেন।

গিন্নীমা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ টাকা বুঝি বে'র জন্যে জমাচ্ছিস্ ? তা বেশ, আমি কিন্তু এতে হাত দিতে দেব না।"

"হাঁ, মা, তুমি ওতে আমাকে হাত দিতে দিও না," বলিয়া কালী হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেল। কালীর বিবাহের

ইচ্ছাটা গিন্নীমার নিকট খুবই একটা আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি করিল এবং সে ঢেউ অচিরেই বাটীর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িল।

কালীর খাটুনি দিন দিন বাড়িয়াই চলিল ; সে রাত্রে দুইটার সময় শয়ন করে, আবার পাঁচটার সময় উঠিয়া নিয়মিত কর্মে ব্যাপৃত হয়। বাড়ীর বউ-ঝিরা কালীকে তামাসা করিয়া বলে, "দিনরাত খাটুনিতে শরীর থাকবে কেন কালী ? শরীর ভাল থাকলে তো বে।" কালী হাসিয়া বলিত, আমাকে ভগবান লোহার শরীর দিয়েছেন, আপনারা আমার জন্যে ভাববেন না।

কালী আর সে বৎসর বাড়ী গেল না, কর্তাকে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিল এবং পত্র লিখাইয়া দিল যে, এ বৎসর কাজ-কর্মের খুবই ভিড়, এ সময় যাইলে বড়ই ক্ষতি হইবে। কর্তা বা গৃহিণী কেহই তাহাতে আপত্তি করিলেন না, কারণ সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, কালী দক্ষিণেশ্বরেই থাকে এবং তাঁহারা তাহাকে সর্বদা নিকটে পান। গিন্নীমা কেবল একবার কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "কি রে কালী, বে না হতেই যে বাপ-মার উপর টান কমালি, বে হ'লে কি করবি রে?" কালী বলিল, "এখানেও কি আমার বাপ মা নেই ?" গৃহিণী কর্তাকে বলিলেন, "তা সত্যি বলতে কি কালীর ওপর পেটের ছেলের চেয়েও যেন বেশি টান পড়েছে। ওটা কেবল মুখে বলছিলাম, কিন্তু ও না যাওয়ায় আমরা সব্বাই খুশি হয়েছি।"

পূজার সময় বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত কালীরও কাপড় চাদর আসিল। বিজয়ার দিন কালী যখন সকলকে প্রণাম

করিল, অন্যান্য আশীর্বাদের সহিত গিন্নীমা আশীর্বাদ করিলেন, "বউটি যেন সুন্দর হয়।"

যাহা হউক, কালীর পরিশ্রম কিন্তু দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। সে এখন সামান্য ফুরসৎ পাইলেই ঝুড়ি বোনে, গিন্নীমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতেও ঝুড়ি বোনে। কোন কোন জ্যোৎস্নারাত্রে এমন হইয়াছে যে, ঝুড়ি বুনিতে বুনিতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে। সে এখন প্রতিমাসে গড়পড়তা কুড়ি টাকার ঝুড়ি বিক্রয় করে।

কবে যে শীতকাল শেষ হইয়া বসন্তকাল আসিয়াছে, কবে যে আম্রমুকুলের সৌরভে ক্ষুদ্র গ্রামখানি ভরিয়া উঠিয়াছে এবং মধুপগুঞ্জনে ও কুহুরবে চারিদিক মুখরিত হইয়াছে, কালী তাহা লক্ষ্যই করে নাই। গত শ্রাবণের যে দিনটিতে সে ঝুড়ি বোনা আরম্ভ করিয়াছিল, আজিও সেই দিনটিই,—এতগুলি দিনকে ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহার চিত্তপটে ও চক্ষের সমক্ষে যেন একটি মাত্র অখণ্ড দিন রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

৫

গৃহিনী—শনিবার, চতুর্দশী, ভরসন্ধ্যে বেলা,—ছি ছি, এমন কাজও করে? সৎকার করতে পাঠাবার কি আর লোক ছিল না? তারপর কোন্ হিসেবে তাকে শ্মশানে একলা ছেড়ে এলে?

কর্তা—তুমি কেবল আমার ওপরেই রাগ করছ! সে আমাকে কোন মতেই সেখানে থাকতে দিলে না। তা ছাড়া,



সে এখন সামান্য ফুরসৎ পাইলেই ঝুড়ি বোনে, গিন্নীমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতেও ঝুড়ি বোনে।

বুঝে দেখ না, ও-রকম বিপদের চেয়ে বড় বিপদও আর নেই, ও কাজটার চেয়ে বড় কাজও আর নেই। কেউ না কেউ তো যেতই।

গৃহিণী—যে যেত সে যেত, বড় কাজে বড়দেরই তো যাওয়া উচিত ছিল।

কর্তা—ভাগ্যে থাকলে তো যাবে? কালীর জন্যে তুমি অত ভাবছ কেন, এতে তার ভালই হবে। তোমরা মেয়েমানুষ ভয়েই মর।

গৃহিণী—যারা যায়নি, তারাও কি সব মেয়েমানুষ নাকি?

কর্তা—মেয়েমানুষের জন্যে মাপ আছে, পুরুষদের জন্যে সেটুকুও নেই।

গৃহিণী—যাও, তুমি একবার তার খোঁজ নিয়ে এস।

এই সময়ে কালী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্তা বলিলেন, "এই নাও তোমার কালীকে; কেবল ভেবেমরতেই জান।" পরে কালীকে বলিলেন, "বাবা, তোমার হয়ে বাড়ী শুদ্ধু আমার ওপর পড়েছে।"

কালী আসিতেই সব মিটিয়া গেল। গত রাত্রে তাহার কিছু খাওয়া হয় নাই, গিন্নীমা তাহাকে আগে কিছু জল খাওয়াইলেন ও এতক্ষণ পরে এইবার নগেনের জন্য ও তাহার বাপ-মার জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কালী তাড়াতাড়ি গোরুকে জাব দিয়া কাজে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মা, ঝুড়ির হাঁড়িটেতে ক'টাকা হয়েছে, আজ একবার বাবাকে দিয়ে গুনিয়ে রাখবেন তো।"

মার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই বহির্বাটীতে গিয়া কর্তাকে বলিয়া আসিলেন, "আজ সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে নাও। কালীর বে'র কত টাকা জমল সেটা একবার গুনে দেখতে হবে।" কর্তা হাসিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল নিতে হবে বইকি, কাজটা তো ছোটখাটো নয়, পুরো এক বেলা নেবে।"

কর্তার আহারান্তে গৃহিণী টাকার হাঁড়িটা আনিয়া হাজির করিলেন। কর্তা বলিলেন, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হোক না, আমিও তামাকটা খেয়ে নিই।"

গৃহিণী—তা কি হয়, তাহ'লে আর বেলা থাকবে না।

কর্তা হাসিতে হাসিতে টাকা গণিতে বসিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পয়সা ও রেজকি বদল করিয়া টাকা গাঁথিয়া রাখিতেন, সুতরাং সহজেই গণনা শেষ হইল। তিনি বলিলেন, "পাঁচশো বাইশ টাকা হয়েছে, আর এই বারো আনা খুচরো পয়সা আছে।" গৃহিণী অবাক হইয়া বলিলেন, "তামাসা ক'রে কাজ নেই, ভাল ক'রে গোন; দু-দু বছরের রোজগার দশ মিনিটের মধ্যে গোনা যায় কি না!"

কর্তা—তুলে রাখ, ঠিক হয়েছে।

গৃহিণী—ভুল-টুল হয়নি তো? ক'কুড়ি হ'ল?

কর্তা—একবার বউমাকে দেখিয়ে নিও না, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন এখন। যা হোক, কালীর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। নিজের মজুরি ছাড়া ফুরসৎমত খেটে পাঁচশো বাইশ টাকা রোজগার বড় সহজ কথা নয়। বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে

সবাই যদি এই রকম করে, তাহ'লে আর দুঃখ থাকে না। দেশের দারিদ্র্যদোষ যায়। কিন্তু একটা কোন উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প না থাকলে, লোকে এমন ক'রে খাটতেও পারে না।

গৃহিণী—যাক ও কথা এখন। বলছিলুম কি, অতটা টাকা সবই তো আর বিয়েতে খরচ হবে না, দুশো টাকা রেখে, বাকি টাকাটার এইখান থেকে দু-একখানা গয়না গড়াতে দিলে হয় না? চণ্ডে স্যাক্‌রা নেউগীদের বউয়ের কি কণ্ঠমালাই গড়েছে! ওদের দেশে কি আর তেমনটি পারবে?

কর্তা—এ দেশের গয়না ওদের দেশে চলবে না তো।

গৃহিণী—কেন?

কর্তা—ওদের দেশে তাকে যে ঠাকুরের সাজ বলে। যাও, এখন খাওগে, ও-সব কথা কালী এলে ব'লো। মনে থাকবে তো—পাঁচশো বাইশ টাকা।

গৃহিণী "বউমা, শুনে রাখো গো" বলিয়া টাকাগুলি আবার তুলিয়া রাখিলেন।

কর্তা বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

৬

যদুবাবু সৈকালের ওভার্‌সিয়ার। তিনি নিত্যই সন্ধ্যার পর বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের নিকট বেড়াইতে আসেন। উভয়ে বাল্যবন্ধু; নিত্য দু-এক ঘণ্টা একত্রে না কাটাইলে, উভয়েই কষ্টবোধ করেন। তিনিও কালীকে বিশেষ ভালবাসেন।

যদুবাবু আসিবার পূর্বেই কালী গিয়া কর্তাবাবার তামাক

সাজিতে বসিল। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় সেই মাত্র গিরিশ ঘোষের বাড়ী হইতে ফিরিয়াছেন, অনেক কষ্টে তাহাদের কিছু আহারাদি করাইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আহা, ছেলেটা যেন উবে গেল, একমাত্র পুত্র, খুবই লেগেছে, লাগবারই কথা।"

কালী—বাবা, আমাদেরই লেগেছে, তা বাপ-মার লাগবে তাতে আর আশ্চয্যি কি! ও-কথা আর মনে আসতে দেবেন না, সংসারে কোন দিনই ও-কষ্টের শেষ নেই।

কর্তা—আজ ওই কথা ভেবে ভেবে, আর যেখানে যাই ওই কথা ক'য়ে ক'য়ে, মনটা যেন অবসন্ন হয়ে রয়েছে। যদু এলে বাঁচি, দু-একটা অন্য কথা হয়।

কালী—আপনি অভয় দেন তো আমি একটা কথা বলি বাবা।

কর্তা—কি এমন কথা কালী যে, অভয় দিতে হবে? আমি অন্য কথাই তো খুঁজছি, তুমি স্বচ্ছন্দে বল বাবা।

কালী একটু ইতস্ততঃ করিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল, আপনাদের না ব'লে একটা কাজ করেছি, তার জন্যে মাপ করতে হবে বাবা। আগে আমি সবটা ব'লে হালকা হই, তারপর আপনি অনুমতি করবেন।

কর্তা—আমার কাছে বলতে অত ভীতু হচ্ছ কেন কালী? তুমি তো কোন মন্দ কাজ করবার ছেলে নও বাবা।

কালী—বাবা, কথাটা আমার উপযুক্ত নয় বলেই কুণ্ঠিত হচ্ছি।

কর্তা—দেখ বাবা কালী, ভগবানের রাজ্যে মানুষ কি আর

ছোট বড় আছে,—এই মানুষই রাজা হয়, এই মানুষই বিদ্বান হয়, এই মানুষই ইচ্ছায় সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়। তুমি আবার উপযুক্ত নও কিসে ?

কালী—দেখুন বাবা, ভটচায্যি পাড়ার রাস্তার মাঝখানে ঐ যে জল-নিকাশের একটা বড় নালি আছে, তার জন্যে সব সময়েই লোককে বড় কষ্ট পেতে হয়, বিশেষ রাত-ভিতে আর বর্ষাকালে—

কর্তা—উঃ, সে কথা আর ব'লো না। কত ছেলে-মেয়ে যে ওতে পড়ে হাত-পা ভেঙেছে, কত বুড়ো-বুড়ী জখম হয়েছে তার আর ঠিক নেই। ও-কথা কতবার তুলেছি, কিন্তু কেউ কান দেয় না, কাজেই ওটা যেন গ্রামের কলঙ্কের মত রয়েই গেল।

কালী—তাই আজ দুবছর থেকে ভগবান ইচ্ছে দিয়েছেন যে, ওর ওপরে একটা পোল হয়; সেইজন্যেই বাবা ঝুড়ি বুনতুম। তা ঐ টাকায় হতে পারে না কি ?

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় সস্নেহনয়নে কালীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, কালী, এ তোমার নিজের গ্রাম নয়, এর সঙ্গে দু দিনের সম্পর্ক, তা ছাড়া পাঁচশো বাইশ টাকাও তোমার পক্ষে অল্প টাকা নয়। যদি একান্তই ওই টাকায় সাধারণের উপকার হয় এমন কোন কাজ করতে চাও তো সেটা নিজের গ্রামে করা ভাল নয় কি ? সেখানেও তো অনেক অভাব আছে।

কালী—নিজের আর পরের ব'লে তো আমার একবারও মনে হয় নি বাবা। হয় সবই নিজের, না হয় কোনটাই নিজের নয়—

সবই ভগবানের, আমি চাকর বই তো না। আপনিই তো কতবার এ কথা বলেছেন। তাঁর হুকুম না এলে এ ইচ্ছে এল কি করে ? আমার তো বাবা বরাবর মনে হয়, এর আগাগোড়াই তিনি, আমার সম্পর্কই নেই।

কর্তা—আমার বলবার মানে এই যে, এ গ্রামে তো ধনী মাতব্বরেরা আছেন, একদিন না একদিন তাঁদের নিদ্রা ভাঙত। তোমার এ কষ্টের টাকাটা—যাক, তোমার এ শুভ সঙ্কল্পে আমি আর বাধা দিতে চাই না। কিন্তু ভগবানের হুকুমটা কি ক'রে এল কালী ?

কালী তখন দুই বৎসর পূর্বেকার সেই শ্রাবণ মাসের বৈকালে ভট্টাচার্যপাড়ার পথিমধ্যস্থ সেই নালার মধ্যে রায় মহাশয়ের বউমার পতন, তজ্জনিত আঘাত ও যন্ত্রণা এবং কলস ভগ্ন হওয়ায় তিরস্কার ও গঞ্জনার ভয়ে তাঁহার সকাতর অসহায় অবস্থাটি সংক্ষেপে বর্ণন করিল। কালী আরও বলিল, "সে সময় পথ জনশূন্য, তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে কাজে যাবার সময়, তাঁর যুগপৎ পতন ও আঘাত এবং ভয় ও যাতনা-জড়িত 'মাগো' শব্দ আমার মনে হতে লাগল আর প্রাণটা কেমন করতে লাগল,—আমি কেঁদে ফেললুম ; মনে হ'ল, এর কি আর উপায় হয় না ? প্রাণের ভেতর কে যেন বললে, হবে না কেন ? করলেই হয়। সেই আমার ভগবানের হুকুম। তখুনি ঝুড়ি বুনে বেচবার মনস্থ করলুম, আর সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় ফেরবার সময় এক বোঝা কঞ্চি কেটে আনলুম। তারপর সবই তো জানেন।"

বর্ষার ধারা-সিক্ত বৃক্ষকে যেমন সামান্য নাড়া দিলে ঝরঝর

করিয়া জল পড়ে, কালীর কথা শুনিয়া ও তাহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া সেইরূপ ঝরঝর করিয়া জল পড়িল। পরিপূর্ণ হৃদয়াবেগে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, কালীর মস্তকে কম্পিত হস্তটি রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমার আশীর্বাদের কোন মূল্যই নেই। ভগবান তোমাকে কৃপা করুন।"

কালী তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "বাবা, এখন এ কাজটি আপনাকে করিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তার মধ্যে আমার নাম বা আমার কথার গন্ধও থাকবে না। বর্ষা এসে পড়বে, খুব শীগগিরই যাতে হয় তা করতে হবে বাবা।"

কর্তা—কার টাকা, কে করছে—লোকে জিজ্ঞাসা করলে কি বলব ?

কালী—আর যা ইচ্ছে হয় বলবেন, কেবল আমার উল্লেখ না হয়। তবে একটা কথা থাকবে—পোল যখন তোয়ের হবে, আমিও তাতে যেন একজন মজুর হয়ে কাজ করতে পাই।

কর্তা—যদুকে তো লুকুতে পারব না, সে আমার বাল্যবন্ধু ; সে তা হ'লে বড়ই ক্ষুণ্ণ হবে। তা ছাড়া এ কাজে আগাগোড়াই তার সাহায্য নিতে হবে।

কালী—তাঁকে যদি বলতেই হয়, স্বীকার করিয়ে নেবেন, তিনি যেন কারও কাছে আমার নাম না করেন।

উভয়ের কথা শেষ না হইতেই—যদুবাবু যেমন নিত্য আসেন, তেমনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কালী তামাক সাজিয়া দিয়া সরিয়া গেল। তামাক খাইতে

খাইতে এ-কথা ও-কথার পর বাঁড়ুজ্জে মহাশয় যদুবাবুর নিকট উক্ত নালার কথা উত্থাপন করিলেন ও তাহার পর প্রথম শ্রেণীর মাল-মসলা দিয়া একটি পোল নির্মাণ করিতে আন্দাজ কত টাকা পড়িতে পারে এবং ন্যূনাধিক কত দিনে যদুবাবু তাহা করাইয়া দিতে পারেন, ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন।

যদু—বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? এ গ্রামের জড়বিগ্রহবৎ বাক্‌বিজ্ঞেরা থাকতে কস্মিন্ কালেও যা হবে না, সে কথায় সময় নষ্ট করা কেন? নিজে কোমর বাঁধতে পার তো কাগজ কলম দাও, এখনই সব ঠিকঠাক করে বলে দিচ্ছি। ওসব তো আমার চোখের সামনে রয়েছে; ওর মাপ-জোকও মুখস্থ রয়েছে, টাকা খরচ করতে কেউ রাজি হয় তো নিজে গিয়ে দু-তিন দিনের মধ্যে মঞ্জুরি নিয়ে, বিশ দিনের মধ্যে পোল তোয়ের করিয়ে দিতে পারি। নিজের ক্ষমতা নেই, কিন্তু জিনিসটে এত দরকারী যে, যদি কোন হৃদয়বান লোক রাজি হয় তো ওর সব খাটুনির ভার নিতে রাজি আছি। কিন্তু আজ দশ-বারো বছরের মধ্যে একটিও তেমন লোক দেখলুম না। কথাটা যেখানে পেড়েছি, সেইখানে হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে। একজন লক্ষপতি—নামটা আর করব না—বলেছিলেন, 'যদুবাবুর খুব দয়ার শরীর দেখছি; যদি এতই কষ্ট হয়েছে তো' নিজেই করে দিন না।' তাই বলছি, ও-প্রসঙ্গে ফল কি?

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় তখন ধীরে ধীরে যদুবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং কালীর অনুরোধটি জানাইয়া সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিতে বলিলেন।

যত্নবাবু কিছুক্ষণ নির্বাক-বিস্ময়ে থাকিয়া বলিলেন, "বল কি ? উঃ, মানুষে ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে—কেবল হৃদয়টা থাকা চাই। টাকা থাকলেই বড় হয় না।" একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "কথাটা সত্যি তো ?"

বাঁড়ুজ্জে—বল তো টাকাটা তোমার হাতে এনে দিই।

যত্ন—কাগজ-কলম দাও।

সেই রাত্রেই যত্নবাবু একটা নক্‌শা এবং মাল-মসলা ও টাকার হিসাব ঠিক করিয়া দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিলেন এবং নিজে সকল ভার লইলেন।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় রাত্রে আহারে বসিলে গৃহিণী মুখ ভার করিয়া ও দুঃখ ও তিরস্কার-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আমার কথা তখন তোমার তো ভাল লাগে নি, এখন তার ফলটা হাতে হাতে দেখতে পেলে ?"

কর্তা—কিসের কথা ?

গৃহিণী—আমার মাথার কথা, আর কিসের কথা! কালীকে ও-কাজে পাঠিয়ে এখন তার মতলব-টতলব কি হয়ে গেল দেখ দিকি। ছেলেমানুষকে কখনও শ্মশানে-টসানে পাঠাতে আছে, তার আর সংসার-ধর্মে মন থাকতে পারে কি? কত শক্ত সমর্থ লোকেই বিবাগী হয়ে যায়!

কর্তা—ওঃ, সেই কথাটা। তুমি পাগল হলে দেখছি!

গৃহিণী—তা তোমাদের হাওয়া পেলে পাগল হওয়াটা আশ্চয্যি নয়। ছেলেটা পাগল না হ'লে আর পাঁচশো বাইশ টাকা মানত করেছি বলে! এ আবার কোন্ রাজ্যিতে শুনেছ ?

কর্তা সহাস্তে বলিলেন, "কালীর বে হ'লেই তো হ'ল। বেশ কথা, ও থেকে টাকা নিয়ে তোমাদের যেমন ইচ্ছে ছুখানা গয়না গড়াতে দাও।"

অন্তঃপুর এতক্ষণ যেন শব্দ ও শ্বাস রোধ করিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্তার কথায় আশ্বাসের ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দে আবার মুখরিত হইয়া উঠিল।

৭

মাতব্বরেরা অবশ্য নির্বিবাদে পোলটা হইতে দেন নাই। প্রথম আপত্তি—তাঁহাদের মতামত, পরামর্শ ও সম্মতি লওয়া হয় নাই, দ্বিতীয় আপত্তি—প্রথম শ্রেণীর মাল-মসলা ভিন্ন ওরূপ একটা জলনিকাশের পথ কোন মতে হইতেই পারে না; তৃতীয় আপত্তি—স্থায়ী ভাবে ওই স্থানে জলনিকাশের পথ রাখিলে ভাবী-কালে গ্রামের কোন অনিষ্ট আছে কি না; ও চতুর্থ আপত্তি—যে করিয়া দিতেছে, তাহার কোন দাবি-দাওয়া ও স্বার্থ আছে কি না, ইত্যাদি। যাহা হউক, যদুবাবু বিচক্ষণতার সহিত সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া কার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করিয়া দিলেন, এবং মিস্ত্রী ও মজুরদের মধ্যে কালীও একজন মজুর থাকায় কোথাও কোনরূপ খেলো কাজের বা খেলো জিনিস চালাইবার সুযোগও হইতে পায় নাই। পঁচাশী বৎসর গত হইলেও সেই তৃণাদপি সুনীচ কাঙালের হৃদ্‌পঞ্জরে গঠিত পথিকপদরজ-প্রার্থী পোলটি আজিও অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া আপনার কর্তব্য পালন করিতেছে।

সনাতনের সংসার-ত্যাগ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১

শহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বহুদূর পর্যন্ত নারিকেল সুপারির সারি চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে লহরী তুলিয়া গঙ্গা নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নারিকেল-কুঞ্জে মর্মর-ধ্বনি ও গঙ্গার মৃদু কুলুকুলু ধ্বনি ব্যতীত আর কোনও শব্দ নাই। সনাতন এই প্রাসাদের কক্ষে ভাগবত-পাঠ শুনিতেছেন নিবিষ্ট মনে। আসন্ন আঁধারের পূর্বেই কক্ষ আলোকিত হইয়াছে —কিন্তু সে আলোকও ক্ষীণ; মাত্র পাঠকের ভাগবত-পাঠ বাধা পাইতেছে না। এমন সময়ে সোপানে পদশব্দ হইল:

একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'স্বয়ং বাদশা!'

অঁ্যা—বাদশা হোসেন শা আসছেন?

সনাতন চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পাঠ তখনও চলিতেছে—উদ্ধব-সংবাদ। ব্রজগোপীরা উদ্ধবকে দেখিয়া বলিতেছেন:

'আমরা কাঙ্গালিনী, তুমি রাজবেশ পরিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছ, নিশ্চয়ই তোমার কোনও উদ্দেশ্য আছে, বল তোমার কি উপকার আমরা করিতে পারি?'

হোসেন শা শুনিলেন এবং সনাতনের দিকে এক দৃষ্টিতে



সনাতন চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পাঠ তখনও চলিতেছে…

কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে কথককে ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

'শোনো, সাকর মল্লিক, তোমার কি হয়েছে, আমায় বলো। অসুখের অছিলা ক'রে রাজকার্য থেকে বিদায় নিয়েছ, অথচ আমার প্রেরিত বৈদ্য বলেছে, তুমি বেশ ভালই আছ। কি ব্যাপার ?'

সনাতন এবারে স্বপ্নোত্থিতের মতো গাত্রোত্থান করিয়া যথা-যোগ্য ভাবে নৃপতিকে অভিবাদন করিলেন। বলিলেন :—

'আমায় ক্ষমা করুন, রাজন্! বিষয়কর্মে আর মন দিতে পারি না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—নিজের সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করেছি—কিন্তু আমি সে সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত, লাঞ্ছিত। আমায় আপনি বিদায় দিন এবং যোগ্য লোককে আমার কর্মে বাহাল করুন।'

'তা হয় না বন্ধু। তোমার মতো বিশ্বস্ত, পণ্ডিত, সুদক্ষ কর্মচারী মুখের কথায় মেলে না। আমার এই সোনার রাজ্যে তোমরাই এমন সৌষ্ঠব এনে দিয়েছ, সে কথা আমি জানি আর খোদা জানেন। আমার দবির খাস চ'লে গেল আমায় দাগা দিয়ে। তুমি যেও না, মন্ত্রি!'

সনাতন চুপ করিয়া রহিলেন। কথক ও অন্য শ্রোতারা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। হোসেন শা একজনমাত্র পার্শ্ব-রক্ষী লইয়া আসিয়াছেন, সেও বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। স্তিমিত আলোকে নবাব দেখিলেন, সনাতনের দৃষ্টি অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা অস্পষ্ট আলোকের মধ্য দিয়া বহু দূরে প্রসারিত

হইয়া আছে। সনাতনের মন যেন সংসার ছাড়িয়া, বহুমান্য অতিথির সম্পর্ক ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কোন্ সুদূর হইতে যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—

'ঐ-ঐ-ঐ শুনুন, আমায় ডাকে। ঐ গৌরবর্ণ বালক তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি আমার এই কুৎসিত মুখের উপর স্থাপন ক'রে আমায় ডাকে।'

বাদশা দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্রী বাতিকগ্রস্ত। তিনি খুশি করিবার অভিপ্রায়ে সনাতনের হাত ছুটি ধরিয়া বলিলেন, 'আমিও যাবো। আমায় নেবে না, বন্ধু ?'

সনাতন আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'তুমি যাবে রাজাধিরাজ ? পারবে না। সে সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে তুমি যেতে পারবে ? কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া বর্ণ, ভুবন-ভুলানো রূপ, তরুণ বয়স—কিন্তু সন্ন্যাসী। সর্বস্বত্যাগ না ক'রলে তাঁর কাছে যে যাওয়া যায় না, রাজন্।'

'আমি যাবো। দক্ষিণ দেশে যাবার জন্যে যে সমর-সজ্জার আয়োজন করা হয়েছে, তা ত বাতিল করা যাবে না। আমি ফিরে আসি ; এসেই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাবে ; কেমন ?'

প্রতিশ্রুতিরূপ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিবার মতো মনের অবস্থা সনাতনের নয়। তিনি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ বিদায় লইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সনাতন দেখিলেন, তিনি তাঁহার নিজের বাসভবনে বন্দী। অসংখ্য অস্ত্রধারী সৈনিক বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মন যাহার বাহিরে ছুটিয়াছে, তাহাকে কি নিগড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়? সৈন্যদলের মধ্যে প্রধান রক্ষককে তিনি চিনিতেন; একসময়ে তাহাকে তিনিই বাহাল করিয়াছিলেন। আজ তাহার নিকট মুক্তির জন্য সনাতন কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহার মন ঐ পাষাণকারারই মতো পাষাণ দিয়া গড়া।

সনাতন জানিতেন, যখন করুণায় মন গলে না, তখন টাকায় মন টলে। তখন তাঁহার যথাসর্বস্ব সেই রক্ষীকে সমর্পণ করিয়া সনাতন তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। রক্ষী সেই হইতে কিছু শিথিলভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

এই অবসরে কারাকক্ষের উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সনাতন গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে চলিল তাঁহার পুরাতন বিশ্বাসী অনুচর ঈশান। রক্ষীর দল নিশীথে আমোদ-আহ্লাদে রত, এমন সময়ে দুইজন বন্দী গঙ্গার স্রোতের টানে বহুদূর ভাসিয়া গেলেন! সংসারের বিষম কারাগার হইতে মুক্ত জীবন স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিল।

২

সনাতন শুনিয়াছিলেন, চৈতন্যচন্দ্র বনপথে শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। সুতরাং সেই পথ অনুসরণ করিয়া ছুটিতে হইবে। দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সনাতন বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিম দেশাভিমুখে চলিলেন। শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল—কিরূপে প্রভুর দর্শন পাইব। কোনও দিন নির্ঝরের

নির্মল জলে তৃষ্ণা দূর করেন, কোনও দিন তাহাও জোটে না। স্বাধীন বঙ্গের প্রখ্যাত ভূপতি হোসেন শাহের মন্ত্রী আজ পথের ভিখারী—ভিখারীরও অধম। গাছতলায় সনাতন যখন চক্ষু নিমীলিত করেন, তখন প্রভুভক্ত ঈশান বিনিদ্রভাবে কাছে বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ বাদে সনাতন উঠিয়া বসেন, বলেন—

'ঈশান, ঘুমোও নাই? একটু ঘুমোও, আমি জেগে আছি।' ঈশানের চক্ষে জল আসে। হায় অদৃষ্ট! দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাঁহার নিদ্রা হইত না, আজ তিনি কঠোর কর্কশ বৃক্ষতলেও একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না। ঈশান শুধু অনুগত ভৃত্য নয়, শিক্ষিত দরদী সঙ্গী।

পথ চলিতে চলিতে উভয়ে এক পর্বতমালার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা সমাগত। পর্বত পার হইবার উপায় নাই। জঙ্গলে ঢাকা পর্বতের মধ্য দিয়া একটি মাত্র সরু পথ, তাহা এক ঘাটোয়াল রক্ষা করিতেছে। সে পার করিয়া না দিলে উপায় নাই।

অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা ঘাটোয়ালের শরণাপন্ন হইলেন। ঘাটোয়াল বলিল, 'রাত্রি-প্রভাতে ও পাহাড় পার করিয়া দেওয়া হইবে, আপাততঃ এ রাত্রিটা আমার বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।'

সনাতনের জীর্ণ বেশ, শীর্ণ দেহ, মলিন বদন, ঈশানেরও ততোধিক। চিরদিন সুখবিলাসে অতিবাহিত করিয়া এ দারুণ ক্লেশ সহিবে কেন?

কিন্তু ঘাটোয়াল বড়ই যত্ন করিতে লাগিল। সে ত জানে না তাঁহারা কে? তথাপি এত যত্ন কেন? তাহাদিগকে ভাল

একটি ঘরে শয্যা-আদি দিয়া রাখিবার এত আয়োজন কিসের জন্য? সনাতন চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টনাম জপ করেন, আর মাঝে মাঝে সংশয়ের কণ্টক মনে বিদ্ধ হইতে থাকে। ঈশান তখন নিদ্রাগত। হঠাৎ তাহাকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন।

'ঈশান, এই ঘাটোয়াল এমনভাবে আমাদের এত খাতির-যত্ন করছে কেন, বল্‌তে পারো?'

'লোকটি বোধ হয় ভাল।' ঈশান উত্তর করিল।

সনাতন ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দেখো, এরা অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করে অর্থবিত্ত যাদের আছে, শুধু তাদের। আমাদের ত কিছুই নেই।'

ঈশানের চক্ষু বিস্ফারিত হইল; চুপি চুপি বলিল, 'প্রভু, আমার কাছে কিছু আছে।'

সনাতন বিস্মিত হইলেন। তখন ঈশানের নিকট হইতে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তিনি ঘাটোয়ালের সন্ধানে চলিলেন। ঘাটোয়াল কপট নিদ্রায় ছিল।

'কি মনে ক'রে ঠাকুর? এত রাত্রে?'

'বাবা, আমরা ফকির মানুষ, তীর্থযাত্রায় চলেছি। সঙ্গে কিছু অর্থও এনেছি সেইজন্যে। কিন্তু টাকা সঙ্গে থাকলেই বিপদ্। তুমি যদি দয়া ক'রে এই বিপদ্ থেকে আমাদের বাঁচাও।'

'কি রকম?' ঘাটোয়াল আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল।

সনাতন বলিলেন, 'আমি তোমার অতিথি। তুমি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছ। তার বিনিময়ে আমাদের এই অর্থ তুমি

গ্রহণ করো।' এই বলিয়া সনাতন তার সম্মুখে সাতটি মোহর রক্ষা করিলেন।

ঘাটোয়াল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, 'ফকির সাহেব, তোমাদের কাছে যে টাকাকড়ি আছে, তা আমার জানতে বাকী নেই। আমি এই কাজ করতে করতে পেকে গেলাম, আমি আর বুঝিনে? যাক্, বড় বিপদ্ এড়ালে ঠাকুর! আজ এই কয়টি মোহরের জন্যে তোমাদের প্রাণ যেতো। কাল প্রভাত আর তোমাদের দেখতে হ'তো না।'

সনাতন শিহরিয়া উঠিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সনাতন পাতড়া পাহাড় পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঈশানকে বলিলেন:

'ঈশান, বন্ধু, আর নয়! একাই ভালো, তুমি ফিরে যাও। ঐ যে একটি মোহর রইলো, তোমার যাবার খরচ ওতেই চ'লে যাবে; তুমি বনপথে যেও না, সোজা পথে যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চ'লে যাও, ভাই। আমার ভাগ্য নিয়ে আমি আমার প্রাণের ঠাকুরের সন্ধানে চলি।'

ঈশান অনেক কাকুতিমিনতি করিল। কিন্তু সনাতন অটল! ঈশান বুঝিল যে, ধর্মের পথ আর সঞ্চয়ের পথ এক নয়।

৩

জীর্ণচীরধারী নিঃশব্দ পথচারী সনাতন বৃন্দাবনের পথ ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে যাত্রীর দলের সঙ্গে দেখা হয়;— জিজ্ঞাসা করেন, 'হাঁগো, তোমরা কি দেখেছ? গৌরবরণ এক

সন্ন্যাসী ? সে মুখে হরি বলে আর ঢ'লে ঢ'লে পড়ে। দেখনি, না ? দেখলে ভুলতে পারে এমন মানুষ নেই।'

সনাতনের বিশ্বাস সেই গৌরবর্ণ নবীন সন্ন্যাসী যেখানে যাইবেন সেখানে স্থাবর-জঙ্গম সবার মধ্যে সাড়া পড়িয়া যাইবে। নরনারী সব মাতিয়া উঠিবে, তুমুল কোলাহল না হইয়া যায় না। কিন্তু কই, কিছু ত শোনা যায় না। জয়ধ্বনি ওই শোনা যায়—ঐ ঐ! কান পাতিয়া শোনেন, কিন্তু এ ত জয়ধ্বনি নয়, হাটের কোলাহল।

শ্রান্তক্লান্ত কলেবর; অনভ্যস্ত পদচারণায় ধূলায় রক্তের চিহ্ন মুদ্রিত হইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় উদাসীন হইয়া পথ চলিতেছেন। কখনও মনে মনে, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতেছেন। আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে। আবার পরক্ষণেই সন্দেহে আকুল হইতেছেন, প্রভু কি কৃপা করিবেন? দর্শনের মুহূর্ত পর্যন্ত শরীর থাকিবে ত?

দীর্ঘদিনের পথ-ক্লেশে রৌদ্রবৃষ্টি-ঝঞ্ঝার দুঃসহ প্রকোপে সনাতনের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কালি-ঢালা হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ শ্মশ্রু সমস্ত মুখখানি ব্যাপিয়াছে। একখানি কম্বল কাঁধের উপর ফেলিয়া জীর্ণ বসনে নগ্নপদে তিনি একাকী তৃণগুল্ম-কঙ্করময় পথে অনির্দিষ্ট যাত্রায় চলিয়াছেন। তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই, কিন্তু উপবাসে, চিন্তায়, পরিশ্রমে তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রান্ত পদযুগলকে অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে চালনা করিয়া যষ্টির সাহায্যে তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন আর ভাবিতেছেন:

প্রভু আমাকে পাগল করেছেন। তাঁর সেই আয়ত চক্ষু দুটি

কেবলই আমাকে ডাকছে ; বল্ছে যেন, 'আর কতদিন আমায় ভুলে থাক্বে ? আমি যে তোমারই পথ চেয়ে রয়েছি।'

প্রভু আমার পথ চেয়ে রয়েছেন! আমায় চিনতে পারবেন ত? আমার মতো তাঁর কত আছে। কিন্তু আমার কেবলই তিনি—আমার কেবলই তিনি।

বারাণসীর পথে সনাতন শুনিলেন, প্রভু এই পথে গিয়াছেন। দেখিলেন, সমস্ত চিহ্নই বর্তমান। পথের দু'ধারে কুসুমগুচ্ছ ম্লান হইয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষশাখায় শুষ্ক ফুলের মালা দুলিতেছে। গৃহে গৃহে পল্লবসারি, মঙ্গলঘটে মঞ্জরী। এই ত, এই ত, সেই প্রাণারাম, নয়নাভিরামের আগমনী। আর কি? আর কি? আমার জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি সার্থক করিয়া, প্রভু, এইবার দর্শন দাও।

প্রকাণ্ড শহর বারাণসী। কালভৈরবের গঞ্জ হইয়া শহরে ঢুকিতে হয়। সনাতন শুনিলেন, প্রভু তপনমিশ্রের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন—নিকটেই। কিন্তু পদ আর উঠে না। সনাতন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সংসারাভিজ্ঞ, অভিজাতকুলপ্রদীপ। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, 'আমি নীচ, অসৎসংসর্গদুষ্ট, বিষয়-বিষে জর্জর। সেই সুকুমার, সর্বত্যাগী, শুচি, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলপাবন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্য নয়। না, আমার অঙ্গের দূষিত বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিতে দিব না। তার চেয়ে আমার প্রাণত্যাগ করা ভাল। যদি পরজন্ম থাকে প্রভুর পাদপদ্ম লাভ করিব।'

'ফকির—'

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বপ্ন যেন হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। 'আমায় বলছেন!'

'হ্যাঁ, বাবা ফকির, তোমাকে প্রভু ডাকছেন। ভিতরে এস!'

সনাতন কাঁদিয়া উঠিলেন।

'বাবা, তুমি ভুল কর নি ত? আমায় প্রভু ডাকবেন কেন? আমি যে বড় পাপী, অপবিত্র, পতিত। প্রভুর নিকট যাবার যোগ্যতা নেই ত আমার। ঠিক বলছো, আমায় ডাকছেন? আর কাউকে নয়?'

'না, ফকির, তোমাকেই ডাকছেন, এস বন্ধু।'

সনাতন চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে উঠিয়া গেলেন।

'কই, কই আমার প্রভু? আমি ত চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।'

'এই যে আমি! সনাতন, তুমি আমারই বক্ষে আছ। নয়ন মেলে দেখ, বন্ধু। তোমারই জন্যে আমি এখানে এসে আজ কতদিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি। তুমি এসেছ? তুমি এসেছ, সনাতন?'

রাজু পাঁড়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরই নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কি না?

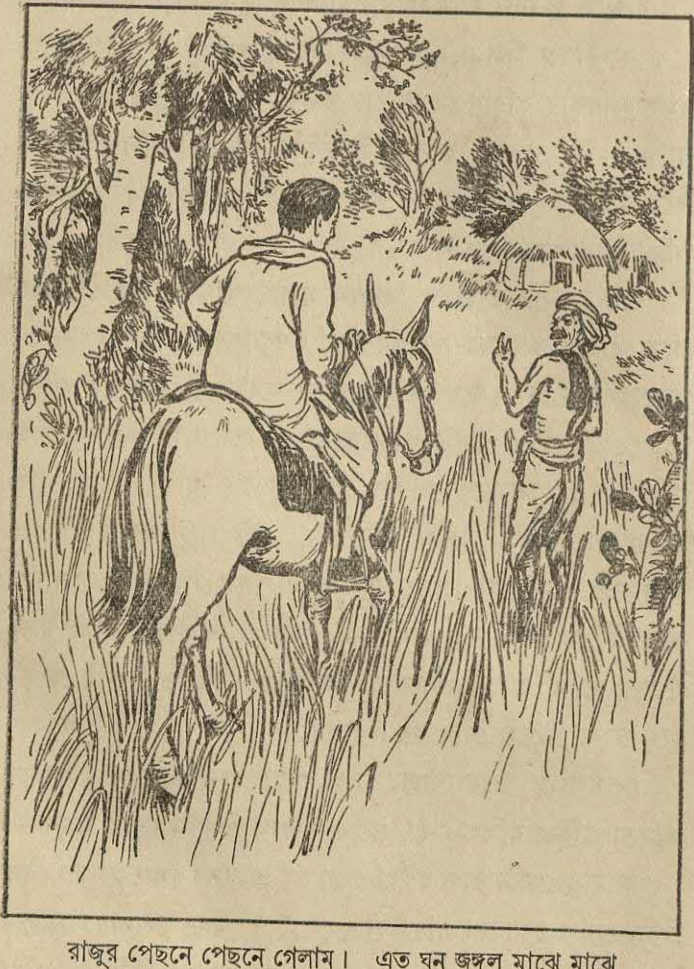
এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে—জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া-বইহারের উত্তরে ঘন-জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথম দু-বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজানা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারিতে বসাইলাম।

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চ'লে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ করনি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল—হাঁ, হুজুর,—চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি ত দেখা যায়নি। দিব্যি স্টেটকে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?



রাজুর পেছনে পেছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে
যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল···

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে ত ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠে নি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন, মকাই কর নি?

—না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা ক'রে উঠতে পারি নি। পনের কাঠা জমি অতি কষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দিয়ে যান।

রাজুর পেছনে পেছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূর গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরি ছোট নীচু দু-খানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আল্‌সে কুঁড়ে লোক তা ত জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু'বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে!

—কেন, কি'কর সারাদিন?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড় গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা

শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রে কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদূর মাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ। ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর একপাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজা-আচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম। রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময়ে দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি, একটা ছোট খাতায় খাকের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন! নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজি, তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?

—সবাই আছে হুঁজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে ?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের তু-মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব ব'লেই ত হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি ক'রে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু তু-বিঘে জমির ফসলে অতবড় একটা সংসার চলবে ? আর তাই বা তুমি উঠে প'ড়ে চেষ্টা করছ কই ?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তারপর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, ব'সে ব'সে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা! ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চ'লে যায়।

দেখিলাম, রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে, বাড়ীতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালই লাগে। সেই গভীর নির্জন লবটুলিয়া-বইহারের

জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

সত্যকারের সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোন ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির উপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরীতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোনদিন হাতে খাতা থাকে, কোনদিন থাকে না।

একদিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশী ক'রে চাষ ক'র, তোমার বাড়ীর লোক না খেয়ে মরবে যে! রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না! সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তারপর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তারপরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল।

কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়ীতে ব'সে দিব্যি ফূর্তি করছ, লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর! আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিভিল সার্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে

দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্তি কুটিরে কুটিরে! সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো বাতাস ঢোকে না কোন ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারারাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটাইয়ে শুইয়া, বয়স পঞ্চাশের কম নয়। সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটী, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বউ, কেউ নেই সংসারে, মেয়েটার বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নাহলে মেয়েটা পথে বসবে।

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে

হাত-তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপরে একটা আঢাকা পাথরের খোরায় ছুটি পান্তা ভাত। ভাতের উপর ছু-দশটা মাছি বসিয়া আছে! কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত!

সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালিকা হয় তো পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্তা ভাত ছুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিবে। বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ! বালিকার সরল, অশ্রুভরা চোখ ছুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ ঘরে খাবার রাখে?

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল, ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজিদের বাড়ী হইতে কাল রাতে ঐ ভাত ছুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এদেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। কিন্তু একটু কড়া সুরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচান গেল না, সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়ীতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা

রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ী। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়ীতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে—এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও ইহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ঔষধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ওঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ঔষধ দেওয়া হয়েছে। ঘুমচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোকে স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর—সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়ীতে আর লোক নাই। রোগগ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ীর ঘর-জামাই। স্ত্রী আর বছর মারা গিয়াছে; তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া সে কোথাও যায় নাই। সম্প্রতি—তাহার অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর লোক তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করিতে লাগিল।

আমি ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ীর অন্নদাস হিসাবে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হ'ল, রাজু?

রাজু গুনিয়া গাঁথিয়া বলিল, এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশি হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, এক টাকা তিন আনা উপার্জন এখানে কম নহে। রাজুকে আজ পনর-ষোল দিন, ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই না খাটিতে হইয়াছে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার একজন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই, ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারিধার ঘিরিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই। সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাহার পালা আসে!

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম, ওবেলার সেই সদ্য-বিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামি-গৃহের পাশে এক বাড়ীর গোয়ালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই—সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের

এক পাশে কয়েক আঁটি গমের বিচালির উপর পুরানো চট পাতা, তাহাতেই বালিকা শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হতভাগিনীকে বাঁচাইবার জন্য। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্যন্ত আসিল না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোকে ঘেঁসে না। রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব? নিজে ডাক্তার নই, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, কিন্তু এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কি না সন্দেহ, আমাদের অনেক তদ্বির ও অনুরোধে জন-দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল, বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থা, তাতে ছেলে মানুষ, কি খেত, কে তাকে দেখত?

বলিলাম, তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

ডাক-হরকরা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপর আকাশে দুর্যোগ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই, সাধারণ অন্ধকারের মধ্যে থাকে যে স্বল্প স্বচ্ছতা তাহাও নাই ; ঘন মেঘের কালো ছায়ায় প্রগাঢ় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। চারিপাশে শুধু অজস্র সঞ্চরমাণ জোনাকির দীপ্তি জ্বলে আর নেবে—জ্বলে আর নেবে, অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিব্যাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ রাস্তার একটা কাদা-ভরা গর্তে গোরুর গাড়ীখানা পড়িয়া একটা ঝাঁকুনি খাইতেই ডাক্তারের চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল। চারি পাশে জল-ভরা মাঠে ব্যাঙের চীৎকার, আশে-পাশে বৃক্ষ-পল্লবের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, তাহারই সঙ্গে গোরুর গাড়ীখানার চাকার বিনাইয়া কান্নার সুরের মত একটি সকরুণ দীর্ঘ শব্দ বেশ শোভনভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশের গাছগুলির পাতায় পাতায় জল ঝরিতেছে, টুপটাপ—টুপটাপ। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তার নুড়িপাথরের কঠিন বন্ধুরতার উপর দিয়া গাড়ীখানা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। দূরে যেন একটা

জোনাকি অনির্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেটা এই দিকেই আসিতেছে।

ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি আলো অটল? বর্ষার রাতে অটল ঘুমে ঢুলিতেছিল, সে একবার জোর করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিয়া বলিল, কে জানে মশায়! অঁই—অঁই—ই গোরুকে কি বলতে হয় বল দেখি!—বলিয়া গোরু দুইটিকে একবার তাড়না করিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

হাঁ, আলোই ওটা, ক্রমশ দীপ্তিটা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে। ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া কে এমন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে? রোগীর বাড়ীর লোক নয়তো?

ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—মৃদু ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল, কে? কে? কে আসছে?

উত্তর আসিল, ডাক—সরকার-বাহাদুরের ডাক। ডাক-হরকরা আমি।—বলিতে বলিতে লোকটি নিকটে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল—বেঁটে, কালো, আধা-বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেল-ব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছেঁড়া একটি মাথালি, এক হাতে একটি বল্লম; এই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে ঝুলানো ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল, কে রে—দীনু?

দীনু ডোম ডাক-হরকরা—মেল-রানার, সাত মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোস্ট অফিসে। সচল দীনু উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতটা রাত্রি হ'ল বল্ দেখি দীনু ?

আজ্ঞে, তা—রাত ভেঙে এসেছে, তিন পহর গড়িয়ে এল আর··· দীনুর কথার শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ীর পিছন দিক হইতে। মেল-রানার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোর শিখাটা ক্রমশ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অটল কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওই বস্তার ভিতরে কি থাকে ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, চিঠি রে, চিঠি।—কত দেশদেশান্তরের খবর, বুঝলি ? এই একশো দুশো পাঁচশো ক্রোশ দূরে যা সব ঘটছে, সেই সব খবর ওই ব্যাগের মধ্যে থাকে।

অটল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, দেশদেশান্তরের খবর ! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, সাধে বলে—বায়ের আগে বাত্তা ছোটে !

বায়ুরও আগে নাকি বার্তা ছুটিয়া চলে। ডাক্তার পিছনের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ওই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে ডাক-হরকরার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টার শব্দ আর শোনা যায় না, অসংখ্য খদ্যোদ্দীপ্তির মধ্যে ডাক-হরকরার আলোক

জোনাকির আলোর মতই ক্ষুদ্র হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার অটলকে বলিল, বায়ের আগে বার্তা ছোটে—কথাটা বেশ, অটল।

ডাক্তারের গাড়ী অন্ধকার পথ ধরিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

ডাক-হরকরা তাহার অভ্যস্ত নির্দিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল। হাতের হ্যারিকেনটার শিখা দ্রুত গমনের জন্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধোঁয়ায় চিমনিটাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে। দীনুর হাতে বল্লমটা বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মাথার মাথালিটা দড়ি দিয়া চিবুকে বাঁধা। ইহাতে শুধু মাথাই বাঁচিয়াছে, দীনুর সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে নামিল।

দীনু কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল, এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার উপায় নাই—হুকুম নাই। গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না। ডাকবাবু বলেন, এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে দীনু।

দীনুর বুকটা শঙ্কায় কেমন গুরগুর করিয়া উঠে। আবার একটু গৌরবও অনুভব করে।

তাহাদের পাড়ার নোটন ডোম চৌকিদারি কাজ করে, দীনু তাহাকে বলে, এ বাবা তোমাদের চৌকিদারি কাজ লয় যে, ঘরে শুয়েই জানলা থেকে দুটো হাঁক মেরেই খালাস, চাকরি হয়ে

গেল! এ হ'ল সরকারী ডাকের কাজ, এক মিনিট দেরি হ'লেই —বাস্, হাতে হাতকড়া।

আজ সাত বৎসর দীনু ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে; প্রত্যহ রাত্রে সে ডাক লইয়া যায়, লইয়া আসে; কিন্তু কোন দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সেবার পুল ভাঙিয়া একদিন কলিকাতার ডাকগাড়ী আসে নাই, একদিন পথে মালগাড়ী ভাঙিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ী আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল; কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়, ঠিক সময়ে আসে।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশে মেঘ যেন জমাট অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে সে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অজগর-জিহ্বার মত বিদ্যুৎরেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া খেলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মেঘের গম্ভীর মৃদু গর্জন,—দূরে পুলের উপর ডাকগাড়ীর শব্দের মত দীনুর মনে হয়। অকস্মাৎ একটা সুতীব্র নীল আলোকে দীনুর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কঠোর বজ্রধ্বনিতে সমস্ত যেন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য ত্রাসে বিহ্বল হইয়া দীনু বলিয়া উঠিল, রাম—রাম—রাম! দূরে কোথায় বাজ পড়িয়াছে। মুহূর্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দীনু আবার তাহার অভ্যস্ত গতিতে ছুটিয়া চলিল। বল্লমের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল, ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

ডাকঘরে যখন সে পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পুঞ্জিত মেঘস্তর পরিষ্কাররূপে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাক নামাইয়া দীনু একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল,

উঃ, বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু, সাঙিন বাজ! বাপ রে, বাপ রে!

পোস্টমাস্টার বলিলেন, ওঃ, বিছানাতে থেকেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম, দীনু। দীনুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এঃ, ভিজে গিয়েছিস যে রে—অ্যাঁ! দাঁড়া বাবা, ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রিগুলো দেখে নিয়ে তোর ছুটি ক'রে দিই, তুই বাড়ী গিয়ে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল্।

দীনু বলিল, তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি একবার। উঃ, বড্ড কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অতঃপর পোস্টমাস্টার ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রি লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপর খটখট শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীনু আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল; কিন্তু উপায় নাই, ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

কই হে, কাগজখানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি!—ইহার মধ্যে, এই ভোরেই জনকয়েক লোক পোস্ট-আপিসের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালীবাবুর সংবাদ-পত্রের সংবাদের জন্য উৎকট নেশা, তিনি হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর ছিল গোবিন্দ রায়। লোকটি স্কুলমাস্টার, তাহার নেশা যত ফ্রী-স্যাম্প্‌লের। 'বিনামূল্যে' দেখিলেই গোবিন্দ রায় সেখানে চিঠি লিখিয়া বসিবে। জার্মানি হইতে বিনামূল্যে সে তাহার কোষ্ঠী তৈয়ারি করাইয়া আনিয়াছে। সে প্রত্যহ আসে, পাছে তাহার স্যাম্প্‌ল গোলমাল করিয়া অন্য

কেহ লইয়া যায়। প্রৌঢ় রামনাথ চাটুজ্জেও আজ আসিয়াছিল, দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ ; চাটুজ্জে উৎকণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানি চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ করে, এদিকে চাটুজ্জে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এ চিঠি তাহার নয়।

ইন্‌সিওর-রেজিষ্ট্রির কাজ শেষ হইয়া গেল। দীনুর এবার ছুটি, সে বাড়ী চলিল। হাতে তাহার খান-দুই রঙিন খাম—কাহার ছেঁড়া চিঠির ফেলিয়া-দেওয়া খাম। সে কয়খানা সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, গোরুটার ঘাস দিতে এত দেরি করিস কেন দীনু ? একটু সকাল সকাল দিস।

ডাকবাবুর গোরুর জন্য ঘাস দীনুকে দিতে হয়।

তাই আনব।—বলিয়া দীনু চলিয়া গেল।

পথে রামনাথ চাটুজ্জের বাড়ীতে তখন মেয়েদের বুক-ফাটা কান্নার রোল উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্মচ্ছেদী বেদনাস্পর্শে এই প্রভাতেও শ্রাবণের আকাশ যেন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল।

দীনু চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল, আহা !

বাড়ীতে আসিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে লক্ষীর হাতে খাম দুইখানি দিয়া দীনু বলিল, কেমন খাম এনেছি, দেখ্ লক্ষী ! কেমন ছবি, আবার কেমন সুবাস উঠছে, দেখ্ ! বেলাত থেকে এসেছে চিঠি।

লক্ষী খাম দুইখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল, চিঠি কি বাবা ?

কালি দিয়ে কাগজে সব নেকা থাকে মা।

কি নেকা থাকে বাবা?

এই—তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি।

আর?

আর কি থাকে—দীনুর মনে সেটা যোগাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

মেয়ে আবার প্রশ্ন করিল, আর?

অকারণে বিরক্ত হইয়া দীনু এবার বলিল, জানি না, যা। আবার কি থাকবে?

লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, বাপের বিরক্তি দেখিয়া সে আর প্রশ্ন করিল না, খাম দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, নেতাই কোথা, মাঠে গিয়েছে?

নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল, জানি না বাপু, কাল সন্‌জতে সেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। সারা রাত আখড়াতে ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দুবার আমি ডাকতে গেলাম তো আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে রুক্ষস্বরে বলিল, লবারের বেটা লবাব, আমার রোজকারে খাবেন আর টেরি ফাটিয়ে লব্বাবি ক'রে বেড়াবেন। তাকে আমার ঘরে ঢুকতে দিও না ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ!

নিতাইয়ের মা বলিল, সে তুমি ব'লো বাপু, আমি লারব।

দীনু উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে আরও রুক্ষস্বরে বলিল, কেনে, লারবি কেনে, শুনি?

ব'লে কে মার খাবে বাপু? ছেলের চোখ যেন লাল কুঁচ, আর লাটাই-ঘোরা হয়ে ঘুরছেই।

দীনু চীৎকার করিয়া উঠিল, মারবে! —বলিয়া সে কোদাল এবং ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে ও ঝুড়ি লইয়া মাঠে যাইতে উঠিয়া পড়িল। স্ত্রী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, এই দেখ, নিজের করনটা একবার দেখ—খাওয়া নাই, কিছুই নাই, বাবু চললেন রাগ ক'রে! খেয়ে যাও বলছি। সারা রাত দোড় দিয়ে হাঁটা—

দীনু ফিরিল, বলিল, ট্যাঁক-ট্যাঁক করা তোর এক স্বভাব!

ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত দেহে মাথায় ঝুড়িতে এক বোঝা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। মাঠে মাছগুলি সে ধরিয়াছে। বাড়ীর বাহির হইতে সে শুনিল, তাহার 'লবাবপুত্তুর' নিতাই বেশ উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে—

হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো—
লোক মরিছে অসম্ভব।

মাছ পাইয়া দীনুর মেজাজ বেশ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছেলেকে কোন কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বেশ হাসিয়া বলিল, গানের ছিরি দেখ বেটার! তাই, একটা ভাল গান গা রে বাপু।—বলিয়া সে নিজেই আরম্ভ করিল—

ওরে আমার কালো মেয়ে ভোবন করেছে আলো।

নিতাই বলিয়া উঠিল, থাম, থাম বাপু, চেঁচিও না তুমি। আমি গাই, শোন—

দীনু অত্যন্ত চটিয়া গেল, সে গান থামাইয়া বলিল, রাখ্ তোর গান। বলি—আমার কথার জবাব দে দেখি আগে। মাঠ যাস নাই কেনে, শুনি?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধু—রো, মাঠ গিয়ে কি হবে? মাঠ গিয়ে কে কবে বড়নোক হয়েছে, শুনি?

দীনু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, এই একরাশ ধান বেচলে তবে তোর একটা টাকা! ধু—রো, মাঠ গিয়ে কি হবে?

নিতাইয়ের মা বলিল, ওরে লবাবের বেটা লবাব, খুব যে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি—একটা পয়সা কখনও এনেছিস তুই?

নিতাই ট্যাঁক খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল—যেন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সেটা। তারপর বলিল, ওই লে, ফের যদি টিকটিক করবি তো বুঝতে পারবি।

মা তাহার অবাক হইয়া গেল। দীনু কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলিল, তুই টাকা কোথায় পেলিরে নেতাই?

হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তর দিল, রাজারা মানিক কোথা পায়?

দীনু গম্ভীর স্বরে বলিল, হাসি-তামাসা নয় নেতাই। বল্ তুই, টাকা কোথা পেলি?

নিতাই বিরক্তিভরে উঠিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, মর তুই ওইখানে বকবক ক'রে, হ্যাঁ।

দীনু উঠিয়া পিছন পিছন দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিল, নেতাই, শোন্, শুনে যা, ফিরে আয় বলছি।

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আখড়ায় চলিয়াছে।

দীনু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। নিতাইয়ের ভাবগতিক তাহার বেশ ভাল লাগে না। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার ও বিড়ি-সিগারেটের প্রাচুর্য দেখিয়া দীনু সন্দেহ করিত স্ত্রীকে—সে-ই বোধ হয় নিতাইকে গোপনে পয়সা-কড়ি দিয়া থাকে। কিন্তু আজ পূরা একটা টাকা এমন তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দেওয়ায় দীনুর চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, শেষ পর্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

স্ত্রী বলিল, মুড়ি দিয়েছি, খাও। খেয়ে একটুকুন গড়াও, বিছানা ক'রে দিয়েছি। ঘাস আমি মাস্টারবাবুর বাড়ীতে দিয়ে আসছি।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, নেতাই টাকা কোথা পেলে বল্ দেখি?

স্ত্রী বলিল, ভ্যালা মানুষ তুমি বাপু! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে বসলে? বেটাছেলে, কোথাও হয়তো পেয়েছে।

দীনু কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

অপরাহ্ণে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। দীনু নিতাইয়ের আপাদমস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীনুর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা-জোয়ান হইয়াছে নিতাই! সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া

তৈয়ারি করিয়াছে! সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয়, ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীনু পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বলিল, এইবার তো জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এইবার একটা কাজে-কম্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে পড়্। লতুন ডাকঘর হচ্ছে আবার রামলগরে—এই ফাঁকে লেগে যা।

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ঢের লোক আছে তোর কাজ করবার। উ কাজ আমি লারব। বাবাঃ, সারা পথ ধুকুর-ধুকুর ক'রে ছোটা, উ কি মানুষে পারে?

নিতাইয়ের মা বলিল, কেনে, তোর বাবা পারে, আর তুই পারবি না কেনে? তোর বাবা কি মানুষ লয় নাকি?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, উ একটা আস্ত ভূত। লইলে, হ্যাঃ—

দীনু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, লইলে কি?

যাও যাও, ব'কো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়লোক হয়ে যেতে তুমি কোন্ দিন।

তার মানে?

মানে আর কি? বললাম, তুমি ভেবে দেখ কেনে।—বলিয়া নিতাই হাত-মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। দীনু নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রী বলিল, হতভাগা উ কি বললে বল দেখি?

দীনু সে কথার কোন উত্তর দিল না, তাহার আর সময় ছিল

না, সে বল্লম পেটি মাথালি ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

ঝুনঝুন—ঠুনঠুন।

ডাক-হরকরা মৃদুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বরাবর সমানভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে একদণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দীনু কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথাও ওভার্সিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোন গাছের ডালে বসিয়া ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই সে রিপোর্ট করিয়া বসিবে, অমনি উপর হইতে জরিমানার হুকুম আসিয়া পড়িবে।

দীনু একবার মাত্র জরিমানা দিয়াছে। গতি-শৈথিল্যের জন্যও নয়, পথে সে বিশ্রামও করে নাই, তবুও তাহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। তখন সে নূতন কাজে ভরতি হইয়াছে, বয়সও তাহার তখন অল্প। ওভার্সিয়ারকে সে ঠকাইয়াছিল। সেদিন পথে যে ওভার্সিয়ার লুকাইয়া থাকিবে, এ সংবাদ হরিপুরের পিয়ন তাহাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিল—দীনু, আজ সাবধান, পথে আজ থাকবে। কে থাকিবে, সে কথা দীনু পিয়নের ভ্রূনৃত্য দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। পথে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই সেদিন আসিতেছিল। সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুন্দীপুরের বুড়াবটতলার অল্প

দূরে আসিয়া দীনুর মনে হইল, গাছের একটা ডাল যেন অল্প অল্প দুলিতেছে। তরুণ দীনুর তরল চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িল। গাছটাকে পাশে খানিকটা দূরে ফেলিয়া স্থানটা সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বল্লমের ঘণ্টাটা সে হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঘণ্টারও কোনও শব্দ হইল না। তারপর ওপাশে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া স্টেশনে ছুটিল। সেদিন খুব একচোট হাসিয়া সে আপন মনেই বলিয়াছিল, থাক, বাবাধন, পথের পানে তাকিয়ে গাছের ওপর ব'সে।

ওভার্‌সিয়ার এদিকে গাছের উপর বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল, নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, তবু মেল-রানার আসিল না দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে নিজেই ছুটিতে ছুটিতে হরিপুর পোস্ট-আপিসে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আসিয়া তাহার চিন্তার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কোথায় গেল মেল-রানার! সে আবার আমদপুর স্টেশনে রওনা হইল। দীনু তখন সেখানকার ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই হরিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। ওভার্‌সিয়ার রিপোর্ট করিয়া বসিল। মিথ্যা বলিলে দীনুর জরিমানা হইত না, বরং ওভার্‌সিয়ারেরই লাঞ্ছনা হইত ; কিন্তু দীনু মিথ্যা বলিতে পারে নাই। পিয়ন তাহাকে বার বার বলিয়া দিয়াছিল—তুই বলবি, আমি ঠিক গিয়েছি হুজুর, ইষ্টিশানের টাইম দেখুন, আবার ঠিক সময়ে ফিরেছি, এখানকার টাইম দেখুন! ওভার্‌সিয়ারবাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

দীনু চিন্তিত মুখে উত্তর দিয়াছিল, তা, আজ্ঞে, কি ক'রে বলব আমি ?

সুন্দীপুরের বটতলার নিকট আসিয়া দীনুর প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে। সে অল্প একটু হাসে। আরও কতবার এইখানে ওভার্সিয়ারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে এখনও কোন কোন দিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ডাক-হরকরা ?

দীনু উত্তরে প্রশ্ন করে, টায়েন ঠিক আছে বাবু ?

জঙ্গলের ভিতর হইতেই উত্তর আসে অথবা হাসিতে হাসিতে ওভার্সিয়ার রাস্তার উপর আসিয়া বলে, ঠিক আছে রে। তোর কিন্তু এক দিনও দেরি হ'ল না দীনু।

ডাক-হরকরা কিন্তু দাঁড়ায় না, ওভার্সিয়ারের এ ছলটুকুও সে জানে। সে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াই যায়, তাহার বর্শার ফলায় বাঁধা ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেই থাকে।

ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

আজও দীনু নিয়মিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ওভার্সিয়ারের কথা মনে পড়ায় নিতাইয়ের চিন্তা ভুলিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি, আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। তারকাদীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মানুষ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীনু প্রশ্ন করিল, উপরস্থারবাবু?

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল।

ডাকাত! ডাক লুঠিতে আসিয়াছে!

মুহূর্তে দীনু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিল, বলিল, খবরদার, সরকারের ডাক।

এই দেখ, বস্তাটা দাও বলছি।

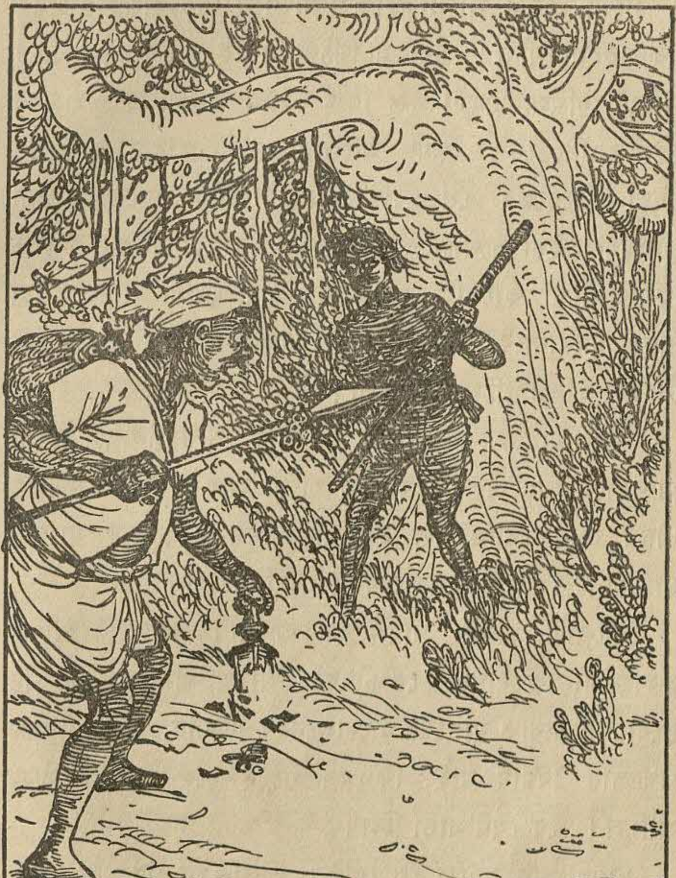
দীনুর হাতের বল্লমটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কে—নেতাই?

নিতাই খাঁ করিয়া দীনুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। পর-মুহূর্তে সে শিকারী পশুর মত মেল-ব্যাগের উপর লাফাইয়া পড়িল। দীনু পড়িয়া গেল, মাথার মাথালিটা গড়াইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও দীনু সবলে মেল-ব্যাগ নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সব্বনাশ হবে নেতাই—কালাপানি—ফাঁসি হয়ে যাবে।

নিতাই ক্ষুধার্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল, টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল, তখন বললে না কেনে—ব'লে রেখে দিলাম এমন ক'রে? দাও বলছি, রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালাব, দাও।

দীনু এবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, ডাকাত—ডাকাত।

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।



উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া নিতাই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল আলো দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্রমশ আলোর প্রভায় স্থানটা প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এবার শেষ চেষ্টা করিল, হাতের লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে দীনুর মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়া কালো একটা তরল ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীনুর মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। দীনু কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবা গো!

আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর একবার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল; কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আলোটা একটা বাইসিক্লের আলো। আরোহী পথিক রক্তাক্ত দীনুকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই, পথে পথিকের পথচলার বিরাম নাই, কিছুক্ষণ পরেই দূরে মানুষের সাড়া আসিল। কে যেন সাড়া দিল।

দীনুর জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘরে একখানা লোহার খাটের উপর সে শুইয়া আছে, মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা, কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া মাথাটা তাহার বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও সারি সারি লোহার খাটে আরও কত লোক শুইয়া আছে।

দীনু বুঝিল, এটা হাসপাতাল। সে পূর্বে কয়বার শহরে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীনুর সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরই পোস্ট-আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন, এই যে, জ্ঞান হয়েছে তোমার!

দীনু সাহেবকে চিনিত, কিন্তু এখন সে তাহার মুখপানে, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন, খুব বাহাদুর তুমি। সরকার তোমার ওপর খুশি হয়েছেন। তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সরকারের ডাক বাঁচিয়েছ, এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড, মানে—পুরস্কার পাবে।

দীনু তবুও নির্বাক।

সাহেব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কতক্ষণ ছিল তারা? কাউকে তুমি চিনতে পেরেছ?

দীনু এবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব নিজে পাখাটা লইয়া বাতাস দিয়া বলিলেন, ভয় কি, কাঁদছ কেন? কোন ভয় নেই, শিগগির ভাল হয়ে যাবে তুমি। ডাক্তার বলেছেন, কোন ভয় নেই তোমার।

তিনি নিজে রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা সুস্থ হয়ে ওঠ তুমি, আমি আবার আসব, রোজ এসে তোমায় দেখে যাব। ও-বেলায় ফল পাঠিয়ে দেব আমি।

দীনু অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল, হুজুর!

কিছু বলবে আমায় ? কি বলবে, বল।

দীনু অতি কষ্টে বলিল, হুজুর, আমার ছেলে—

তোমার ছেলে—তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও ?

দীনু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল, হ্যাঁ হুজুর।

আচ্ছা।

সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিস। পুলিসের বড়সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু ডাকসাহেবের মত এত সহজে দীনুকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি বার বার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কাউকেই তুমি চিনতে পার নি ?

দীনু উত্তর দিল, অন্ধকার হুজুর।

কতজন ছিল তারা ?

ভাবিয়া চিন্তিয়া দীনু আবার বলিল, অন্ধকার হুজুর।

আচ্ছা, কি রকম দেখতে বল তো ? খুব জোয়ান ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক, কি ছোটলোক ?

দীনু চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, কি বলিবে, কাহার নাম সে করিবে ? মিথ্যা করিয়া অন্য কাহারও নাম—

দীনু শিহরিয়া উঠিল।

সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুকে লক্ষ্য করিতেছিলেন ; তিনি বলিলেন, দেখ, তুমি তাদের জান, চিনতে পেরেছ ; বল তুমি, সে কে ?

দীনু বিবর্ণ মুখে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব এবার রক্তচক্ষু হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, বল।

দীনু বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, হুজুর, আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন না, তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, সে তোমার ছেলে?

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দীনু বলিল, হ্যাঁ হুজুর।

আর? আর কে?

আর কেউ না।

পুলিস কিন্তু নিতাইকে পাইল না। সেই রাত্রি হইতেই নিতাই নিরুদ্দেশ। তাহার উদ্দেশ করিতে পুলিস উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—এগারো বৎসর। দীনু আজও ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নায়, বাদলে, বর্ষায়, দুরন্ত শীতের রাত্রে এখনও সে তেমনই কোমরে পেটি বাঁধিয়া বল্লম আলো হাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তেমনই তাহার ঘড়ির কাঁটার মত গতি।

নিতাই কিন্তু সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আজও তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই। সরকারের মুলুকে সর্বত্র থানায় থানায় নাকি তাহার আকৃতির বিবরণ দিয়া হুলিয়া বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় নিতাই?

দীনুর স্ত্রী সময় সময় ঘরের মধ্যে অতি মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে; দীনু বাড়ীতে থাকিলে নির্বাক্ হইয়া বাহিরে

দাওয়ার উপর দুই হাতে মাথা ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। সান্ত্বনাও দিতে পারে না, বিরক্তি-প্রকাশও করে না।

পাড়াপড়শীরা দীনুর নাম দিয়াছে—যুধিষ্ঠির। তাহাদের অশিক্ষিত জড়তাযুক্ত জিহ্বায় তাহারা বলে—যুজিষ্টির।

লজ্জায় দীনুর মাথাটা নুইয়া আসে। মাথা হেঁট করিয়া পাড়ার পথে সে যাওয়া-আসা করে। পোস্ট-আপিসেও তাহার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে কেহ নূতন ডাকবাবু কি ডাকসাহেব আসেন, তিনিই জিজ্ঞাসা করেন, দীনু কে ?

দীনু মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়ায়। সেদিন সে অন্তরে অন্তরে রুক্ষ হইয়া উঠে, অকারণে পিয়নদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। সেদিন তাহাদের বাসন মাজিয়া দেয় না, ডাকবাবুর গোরুর ঘাস আসে অত্যন্ত কম।

পিয়ন বলে, এত গরম ভাল নয় রে, বুঝলি ?

সেদিন কার্ত্তিক মাসের একটি স্বল্প শীতকাতর রাত্রি। কার্ত্তিক মাসেই শীত এবার ঘন হইয়া আসিয়াছে। দীনু ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই আমদপুর পোস্ট-আপিসে হাজির হইল। এই আদমপুরেই রেলওয়ে স্টেশন, এখানকার পোস্ট-আপিস হইতে আবার ডাক লইয়া দীনু হরিপুর ফিরিবে। ডাক ফেলিয়া দিয়া সে তাহার নির্দিষ্ট চটখানা বিছাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। আপ ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গেলে ডাক লইয়া তাহাকে আবার রওনা হইতে হইবে। পাশে আরও কয়েকজন মেল-রানার শুইয়া আছে। তাহারা গল্প করিতেছিল ওভার্-সিয়ারকে লইয়া। জরিমানার প্রত্যক্ষ কারণ এই লোকটি

কখনই ভাল লোক নয়, এই তাহাদের প্রতিপাদ্য ছিল। ও-পাশে দুই জন বোধ হয় ঘরের সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছিল।

ওদিকে স্টেশনে আপ মেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

দীনু বিরক্তভাবে বলিল, একটুকুন ঘুমো বাপু সব। পশ্চিমের ডাকগাড়ীর ঘণ্টা হয়ে গেল। কলকাতার গাড়ী এলেই তো আবার সেই তল্পি কাঁধে তোল্।

একজন ব্যঙ্গ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, চুপ চুপ, ধম্মপুত্তুর যুজিষ্টির রেগেছে।

চাপা হাসির গুঞ্জনের শব্দে দীনু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মনে পড়িয়া গেল নিতাইকে। নিতাই মরিয়া গেলে দীনু এতদিন হয়তো তাহাকে ভুলিত। জীবন্ত মানুষ হারাইয়া যাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল; এ যে প্রতি প্রভাতে মনে হয়, আজ সে আসিবে; দিন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কাল সে আসিবে। সকলের চেয়ে বড় আক্ষেপ দীনুর—নিতাইয়ের সন্ধান সে করিতে পাইল না। সেদিন একজন যাত্রী এই স্টেশনেই একটা আনি হারাইয়া সমস্ত রাত্রি পথের ধূলা ঘাঁটিয়া খুঁজিয়াছে। আর একটা মানুষ—

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম ভাঙিল তাহার পিয়নদের ডাকে। ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন পোস্ট-আপিসের জন্য ডাক বাঁধা হইতেছিল। হরকরারা আপন আপন পেটি বল্লম লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। প্রস্তুত হইয়া দীনু তামাক সাজিতে

বসিল। ওদিকে ছোকরারা একটা আগুন জ্বালাইয়া হাত-পা গরম করিতে বসিয়াছে।

ঘরের ভিতর হইতে পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, ও দীনু, আফ্রিকাতে তোর কে আছে রে, অ্যাঁ—ইন্‌সিওর ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে?

দীনু আশ্চর্য হইয়া গেল, বলিল, সি আজ্ঞে, কোথা বটেন?

ওঃ, সে জাহাজে ক'রে যেতে হয় রে, সমুদ্দুর পেরিয়ে। কাফ্রীর মুলুক সে, মানুষে সেখানে মানুষ খায়, প্রকাণ্ড বড় বড় বন, সিংহি গণ্ডার বাঘ ভাল্লুকে ভরতি সে সব।

দীনু আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সে দেশের নামই আমি শুনি নাই কখনও।

দাঁড়া দাঁড়া, কে পাঠাচ্ছে দেখি! এ যে দেখছি, সাউথ আফ্রিকান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি—জাহাজ কোম্পানি! ওঃ, এ যে অনেক টাকা রে—সাড়ে পাঁচশো টাকা!

দীনু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিল, আজ্ঞে, দেখি বাবু একবার।

পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, দেখে আর কি করবি বাবা, একেবারে হরিপুর পোস্ট-আপিসেই গিয়ে নিবি!

ডাক বাঁধিয়া দীনুর কাঁধে তুলিয়া দিয়া দীনুকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। আকাশে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। চাঁদ পাণ্ডুর, 'সাত ভাই' তারাগুলিও ডুবিল বলিয়া। শেষরাত্রির বাতাসে যেন হিম ঝরিতেছে। দীনু জনহীন পথে চলিয়াছে, ঝুনঝুন—ঝুনঝুন। চলিতে চলিতে

সে ভাবিতেছিল—কোন্ দেশ-দেশান্তর হইতে জাহাজ কোম্পানি তাহাকে টাকা পাঠাইল, কিসের জন্য ?

অল্প টাকা নয়, সাড়ে পাঁচশো টাকা—উঃ, সে কত টাকা! ব্যাগটা যেন দীনুর ভারী মনে হইতেছিল। সহসা দীনুর খেয়াল হইল—এ কি, সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে! সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে পথের কোন্‌খানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানি ? কিসের জন্য তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে ? সে যেন দেখিতেছিল—বিশাল অন্ধকার অরণ্য, বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানি কই ? দীনু তাহার পিছনটা দেখিতেছে, সে যেন পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে।

সহসা তাহার মনে হইল, ওই কোম্পানি তাহার নিতাই নয়তো ? নিতাই হয়তো দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। পাকা বাড়ী গাড়ী ঘোড়া চাকর—কল্পনার গভীর অরণ্যে মুহূর্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুনকাম-করা পাকা বাড়ীর মত বাড়ী।

দীনুর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম-শীতল রাত্রির শীতজর্জর সেই শেষ প্রহরেও সে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কাঁধের কাগজের বস্তা যেন সোনায়-বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে। একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে

তাহার পাশে দাঁড়াইল। চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে। বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার পরিমাণ হয় না, হৃৎপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছটফট করিতেছে। দীনুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্তে—এইখানেই ব্যাগটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়।

পর-মুহূর্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুঠিতে আরম্ভ করিল, প্রাণপণে ছুটিল।

এ কি, পাখিরা কলকল করিয়া ডাকিয়া উঠিল যে! ভোর কি হইয়া গেল নাকি? কই, আকাশে 'ভুল্কো' তারা কই? কিন্তু দীনুর যে এখনও অনেক পথ বাকি! এই তো ষোলো মাইলের পাথর সে পার হইল! এখনও যে তিন মাইল পথ তাহাকে যাইতে হইবে!

দীনু যখন হরিপুর পোস্ট-আপিসে পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা, প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে। পোস্ট-মাস্টার, পিয়ন, সংবাদ-প্রার্থীর দল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীনু ক্লান্তভাবে ব্যাগটা ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এত দেরি কেন হ'ল রে? এ কি, তোর কি অসুখ করেছে দীনু?

দীনু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ডাকটা কেটে ফেলেন বাবু।

আচ্ছা আচ্ছা, ব'স্, শিগগির তোর ছুটি ক'রে দিচ্ছি।

ডাক কাটিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এ কি রে, তোর

নামে যে একটা ইন্‌সিওর দীনু! টাকাও তো কম নয়, সাড়ে পাঁচশো! ওঃ, এ যে আফ্রিকা থেকে আসছে দেখছি!

দীনু কথা কহিতে পারিল না, শুধু হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, হাতটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পোস্ট-মাস্টার হাসিয়া বলিলেন, দাঁড়া একটু, জমা ক'রে নিই।

পিয়ন বলিল, আমাদের কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে, মিষ্টি খাব।

দীনু নির্বাক্। জমা করিয়া লইয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এইখানে একটা টিপ-ছাপ দে তো দীনু, হ্যাঁ—নে, এই নে।

খামখানা হাতে লইয়া দীনু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, জাহাজের ছবি আঁকা সুন্দর খাম, ছাপার হরফে নাম লেখা।

মাস্টার বলিলেন, দে, দেখি খুলে।

সন্তর্পণে ছুরি দিয়া খামখানা কাটিয়া সর্বাগ্রে তিনি নোট কয়খানা দেখিয়া বলিলেন, নে, ঠিক আছে সব। এ নোট আবার তোকে ভাঙাতে হবে। এই যে, চিঠিও রয়েছে।

চিঠিখানা তিনি মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

খানিক পরে দীনু ডাকিল, বাবু!

বাবু ভাবিতেছিলেন, কি বলিবেন! নিতাইয়েরই সংবাদ, নিতাই সেখানে জাহাজে খালাসীর কাজ করিত, সে মারা গিয়াছে। কোম্পানি তাহার অন্তিম-নির্দেশমত তাহার সঞ্চিত অর্থ দীনুকে পাঠাইয়াছে।

দীনু আবার প্রশ্ন করিল, বাবু!

কি লিখেছে ভাল বুঝতে পারছি না রে। আচ্ছা, নিতাই কে? নিতাই তো তোর সেই ছেলে?

হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন আছে সে? কোথা আছে?

পোস্ট-মাস্টার নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দীনু বলিল, নিতাই নেই?

পোস্ট-মাস্টার নীরব হইয়াই রহিলেন। দীনুও মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। কত কথা এলোমেলোভাবে তাহার শোকাতুর মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—সবই নিতাইয়ের কথা।

পোস্ট-মাস্টার অপরাধীর মত বলিলেন, আনন্দ ক'রে চিঠিটা খুললাম দীনু, কিন্তু শেষ আমিই তোকে এই খবরটা দিলাম!

দীনু চমকাইয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িল, সে নিজেই তো চিঠিখানা আনিয়াছে।

থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, উঃ এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে! কত—কত—কত, সংখ্যা হয় না। মনে হইল, আজও পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।

চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

জয়-পরাজয়

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ফুটবল ম্যাচ—

ওদিকে শিমূলতলা হাইস্কুলের বাছা বাছা ছেলে, এদিকে চকদীঘির হাইস্কুলের ছেলেরা।

ফটিক ভেবেই পায় না—শিমূলতলা স্কুলের ছেলেরা এত শক্তি পেলে কোথায় ?

আজ তারা ম্যাচ লড়তে এলো—এ তো বড় কম কথা নয় ! এই তো গত বৎসরও খেলায় নাম দিয়ে খেলতে এসেছিল তোড়-জোড় করে। প্রথম খেলাতেই গোলের পর গোল—সে কি ভীষণ পরাজয়। দাঁতে কুটো করে শেষটায় পালাবার পথ পায় না, নাক-কানও মলেছে নাকি,—আর নাকি তারা চকদীঘির সঙ্গে কোনদিন খেলতে নামবে না।

সে তো এই সেদিনকার কথা,—এর মধ্যে তারা সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ? ছ'দিন না যেতেই তারা এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আজ আবার সদর্পে খেলতে এসেছে !

শিমূলতলা আর চকদীঘি, আসলে এদের দ্বন্দ্ব চিরদিনের চিরকালকার। শিমূলতলার লোক যদি যায় পূবদিকে, চকদীঘির লোক যাবে পশ্চিমে, এমনি ধারা চলে আসছে পুরুষানুক্রমে ! চকদীঘি যেখানে 'হাঁ' বলবে, শিমূলতলা নিশ্চয়ই সেখানে 'না' বলবে। চকদীঘির বাবুরা একটা হাইস্কুল করবেন—মাইনর

স্কুলটাকে হাইস্কুলে পরিবর্তিত করবার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন, খাটলেনও বিস্তর, যাতে করে মাইনর স্কুল শীঘ্রই হাইস্কুলে পরিণত হয়। এলেন বি-এ. বি-টি. হেডমাস্টার, তাঁর সঙ্গে আরও কতজন শিক্ষক।

দেখতে না দেখতে, আশ্চর্য, শিমূলতলাতেও এলো জাগরণ! জমিদার বাবুরা কখনও কলকাতা ছেড়ে গ্রামে আসতেন না, তাঁরাও এলেন ফিরে, এবং অজস্র অর্থব্যয়ে শিমূলতলার পাঠশালাটাকে হাইস্কুলে পরিণত করে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এঁদের স্কুলের হেডমাস্টার এলেন এম-এ. বি-টি.; শিমূলতলা চকদীঘির পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসলো।

চকদীঘি হাঁক দিলে—"শিমূলতলাকে যে-কোন রকমে পরাজিত করতেই হবে।"

পথে-ঘাটে ছেলেদের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের ছেলেদের দেখা হলে উভয় পক্ষই পাশ কাটায়। সেদিন চকদীঘির ছেলে গোবিন্দকে শিমূলতলার বনমালী দাস মুখ ভেংচে বক দেখিয়ে গেছে, চকদীঘি একদিন সদলবলে গিয়ে শিমূলতলার চৌমাথায় লাফিয়ে গালাগালি করে শাসিয়ে এসেছে। সেই শিমূলতলা যে এবার বুক ফুলিয়ে ম্যাচ খেলতে আসছে!

ফটিক ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে, দলের কাপ্তেন, ভাবনাটা তাই বেশি। চিন্তিত মুখে সে হাঁক দেয়—"নকড়ে"। ফটিকের ডান হাত নকড়ি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—"কি ?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে ফটিক বলে, "ব্যাপারটা কি বল্ তো, বড্ড ভাবিয়ে তুলল যে!"

ভাববারই কথা। শিমূলতলা টিমের কাপ্তেন হরু ঘোষকে কে না চেনে? রোগা হাড়-জিরজিরে ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়। মা জমিদারবাবুর বাড়ীতে রান্নার কাজ করে, তাতে কোন রকমে মা-ছেলের দিন চলে। জমিদারের স্কুলে পড়ে, বই খাতা-পত্র স্কুল হতেই পায়। এই হরু ঘোষ হয়েছে দলের কাপ্তেন, কিন্তু পারবে সে চকদীঘির সামনে দাঁড়াতে?

বৃন্দাবন বললে, "শুনলুম ওরা নাকি বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনছে, তাই ওদের এত জোর।"

"বাইরের খেলোয়াড়!—হুঁ!" ফটিকের মুখখানা বড় বেশি রকম বিপন্ন দেখায়।

বেচা বললে, "শুধু তাই নয়, ওরা দলকে দল রক্ষে-কবচ পরেছে,—মা কালীর ফুলবেলপাতা তাতে ভরা। জমিদার-বাবুর পুরুত সারাদিন উপোস করে থেকে অমাবস্যার রাত্রে এই রক্ষে-কবচ তৈরী করেছেন।" ফটিক ভ্রূকুটি করে। খানিক চুপ করে থেকে বলে সে, "রক্ষে-কবচ পরে খেলতে আসা—তাও ভাড়া-করা খেলোয়াড় নিয়ে! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! চকদীঘির যেন এ দুর্মতি না হয়, ঠাকুরের নির্মাল্য নিয়েও যেন খেলতে না যায়!

ভীরু কাপুরুষ শিমূলতলা—একেবারে কাপুরুষ, নইলে, রক্ষে-কবচ নিয়ে খেলতে আসে?"

শিমূলতলা গ্রামের একপাশে একটি কুঁড়ে ঘর, বেড়ার

দেয়াল, খড়ের চালা ; এই ঘরেই থাকে হরু বা হরেন ঘোষ তার দুঃখিনী মাকে নিয়ে।

একমাত্র উদ্দেশ্য হরুর—সে বড় হবে, দুঃখিনী মাকে সে সুখী করবেই। এইবার ফটিকের সঙ্গেই সে দেবে ম্যাট্রিক।

এখানকার ফুটবল টিমের কাপ্তেন ছিল বলরাম, কিছুদিন আগে সে চকদীঘির দলে যোগ দিয়েছে। স্কুলে সে ফ্রি-তে পড়তে চেয়েছিল ; কিন্তু অবস্থা ভালো, বেতন দেওয়ার সামর্থ্য আছে জেনে হেডমাস্টার নীলমণিবাবু তাকে ফ্রি-তে নেন নি। অত্যন্ত রাগ করেই সে শিমূলতলা ছেড়ে যোগ দিলে চকদীঘিতে, সেখানকার হেডমাস্টার জগন্নাথবাবু বিনা প্রতিবাদে তাকে গ্রহণ করলেন।

কি জানি কেন—ফটিক তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ক'রে যে লোক নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, পরের দেশের সে উপকার করবে এ আশা করাই বাতুলতা। ইতিহাস এ রকম লোকদের ঘৃণিত ভাবে এঁকেছে, এসব লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকবার উপদেশই দিয়াছে।

কি ক'রে সে বিশ্বাস করে বলরামকে? চিরকাল যেখানে বাস, সেখান হতে যে লোক সামান্য একটু ত্রুটি দেখলেই সরে পড়ে, অক্লেশে অসঙ্কোচে বিপক্ষদলে যোগ দেয়, তাকে বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য।

তার মনস্তুষ্টির জন্য বলরামের চেষ্টার অন্ত নেই—শিমূল-

তলার অতিগোপন কথা পর্যন্ত সে ব্যক্ত করে দেয়, 'যেন তেন প্রকারেণ' এদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার চেষ্টা করে।

বিশেষ করে এই জন্যই ফটিক দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে,—তার মুখের পানে তাকিয়ে বলরাম তাকে যেন কতকটা বুঝতে পারে!

পথের ওপর হঠাৎ দেখা হরেন ঘোষের সঙ্গে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিঃশব্দে দুজনের পানে কেবল তাকিয়ে থাকে।

দীর্ঘকায় ফটিক, আর শীর্ণদেহ হরেন। দু-তিন মিনিট তাকিয়ে থেকে হরেন চোখ ফিরিয়ে পিছন ফেরে।

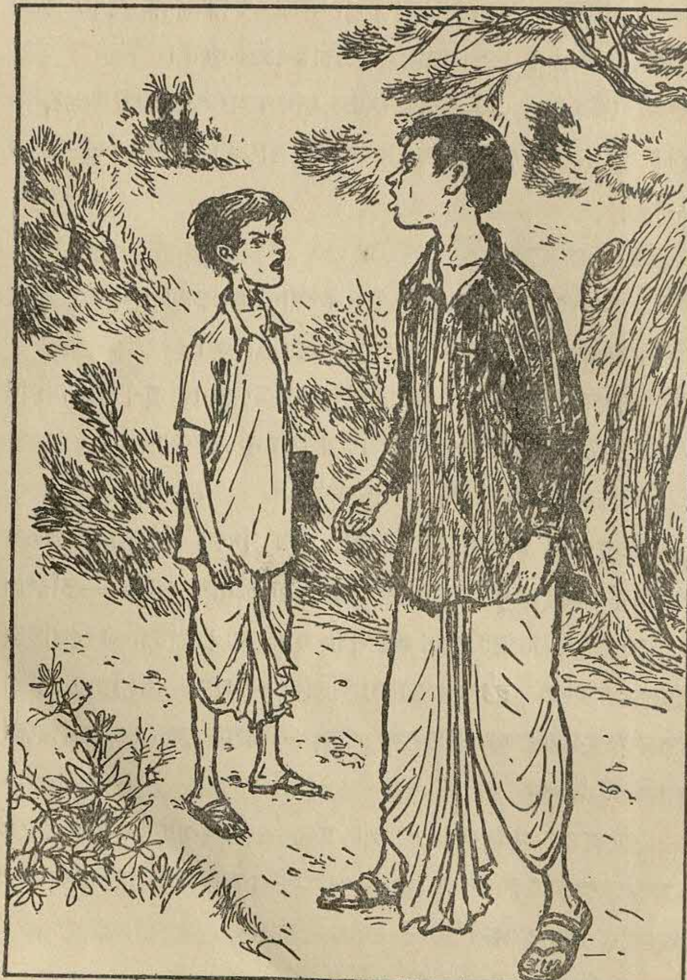
ফটিক ডাকে, "এই—শোন—"

ভদ্রতার অনুরোধেই হরেন তার দিকে ফিরল। ফটিক আবার একবার দৃষ্টি বুলোয় তার পা হতে মাথা পর্যন্ত,—তারপর বললে, "তোমাদের তো আস্পর্ধা কম নয়! চিরদিন পেছিয়ে থেকে আজ হঠাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা কেন? বলি আলাদীনের প্রদীপ-টদীপ কোথাও পেয়েছো নাকি?"

হরেনের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে,—মুহূর্ত নীরব থেকে সে বললে, "আস্পর্ধা নয়—যা সত্যিকার প্রাপ্য তাই দখল করবার চেষ্টা হচ্ছে।"

"সত্যিকার প্রাপ্য?"

ফটিক খুব জোরে হেসে ওঠে, সে হাসি হরেনকে যেন চাবুক মারে!



"তোমাদের তো আস্পর্ধা কম নয়! চিরদিন পেছিয়ে থেকে আজ হঠাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা কেন?..."

ফটিক বিদ্রূপ করে, "এই যে—ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলের নাম পদ্মলোচন! যে হরুর মুখে সাত চড়ে কথা বার হত না, আজকে সে খাসা জবাব করতে শিখেছে! জমিদার-বাড়ীর ভাতের গুণ আছে দেখছি।—ঘি-দুধও নির্ঘাৎ জোটে জমিদার-বাড়ী, ব্রেণের শার্পনেস দেখে তো তাই মনে হয়।"

হরেন মুখ তুলে তার দিকে তাকালো,—একটি কথাও সে বললে না, আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার উদ্যোগ করে সে।

ফটিক ধমক দেয়—"ওহে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? দাঁড়াও, আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও।"

শান্ত সুরে হরেন বললে, "আমার এখন উত্তর দেওয়ার সময় নেই। আমার মায়ের অসুখ, ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ঘি-দুধ খাই কি ফেনভাত খাই, উত্তর দেব খেলার মাঠে, আজ নয়।"

হন্ হন্ করে সে চলে গেল।

ফটিকের চোখ দুটি ধক্ ধক্ করে মুহূর্তের তরে জ্বলে উঠেই অসম্ভব কোমল হয়ে পড়ে।

পরাজয় হল তার, কিন্তু এ পরাজয়ে তার দুঃখ হচ্ছে না। হরেনকে তার ঈর্ষ্যা করতে ইচ্ছা হয়। তার বাড়ীতেও আজ কয়দিন মায়ের অসুখ, সে কানে শুনেছে কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়ার এক মিনিট ছুটি তার নেই। আর হরেন,—তার মাথায় কত বড় দায়িত্ব, তবু সে নিজের কাজ ঠিক মত করে যাচ্ছে!

•

নিঃশব্দে হাঁটে ফটিক, তার পিছনে তেমনই নিঃশব্দে পা ফেলে হেঁটে আসে তার দক্ষিণ হস্ত, নকড়ি।

•

রাতের অন্ধকারে গা লুকিয়ে দুজনে চলে। আকাশে তেমনি ঘন কালো মেঘ, কিন্তু তার চেয়ে ঘন মেঘ ফটিকের মনে—সে মোটেই শান্তি পাচ্ছে না।

নকড়িই এসে খবর দিয়েছে—তার ডান হাত নকড়ি। নিজে সে তার মর্যাদা নিয়ে যে সব জায়গায় যেতে পারে না, সে সব জায়গায় অক্লেশে যায় নকড়ি এবং ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বার হয়।

নকড়ি জানিয়েছে হরেনের অবস্থা। হরেন নাকি খেলায় নামতে চায়নি, কেবল স্কুলের হেডমাস্টার এবং জমিদার রাখহরি সেনের জিদেই সে নামতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য, খেলতে সে খুব ভালোই পারে, স্কুলের মাঠে প্রতিপক্ষকে সে তাক লাগিয়ে দেয়, তবু রেষারেষির মধ্যে খেলতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু উপায় তার নেই। জমিদার-বাড়ীতে খায় সে, ফ্রি-তে পড়ে জমিদারের স্কুলে, তার মাও জমিদার-বাড়ীতে কাজ করেন। জমিদার শাসিয়েছেন—এই খেলায় যদি শিমূলতলা হেরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হরেনের অন্ন উঠল, পড়াও সাঙ্গ হল, অতএব হরেন যেন বুঝে সুঝে চলে!

ফটিকের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, মন দিয়ে সে হরেনের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করে।

বেচারা—অনেক আশা করে আছে এবার ম্যাট্রিকটা দেবে, ভালোভাবে পাশ করতে পারলে সাহায্যও সে কিছু পেতে পারবে যা দিয়ে তার আই. এ. পড়ার খরচটা চলে যাবে।

আসন্ন পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল সে, উপস্থিত সে-সব বন্ধ রাখতে হয়েছে।

প্রতিপক্ষ হরেনের অবস্থাটা ফটিক বোঝে।

নকড়ি বলেছিল, "লুকিয়ে একদিন বরং আমার সঙ্গে ওর অবস্থাটা দেখে আসবে চল, ফটিক! একবার দেখলে সত্যি তুমি চোখের জল রাখতে পারবে না—এ আমি নির্ঘাৎ বলে দিচ্ছি। এই খেলার ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেইটে বুঝে তুমি কাজ করো।"

নকড়ির মুখে এ কথা—যেন ভূতের মুখে রাম নাম! হেন লোক নেই নকড়ি যার সম্বন্ধে কোন কথা বলে না, কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল শুধু হরেনের বেলায়।

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, রুগ্ন-প্রকৃতি, নিতান্ত ভালো মানুষ এই ছেলেটিকে সবাই যেমন স্নেহ করত, বিশ্বনিন্দুক নকড়িও তার চেয়ে কম করে নি। ফটিককে লুকিয়ে সে বই, খাতা সব দিয়ে আসে তার যাতে কিছু সাহায্য হয়।

ফটিক চেয়েছিল তার অস্তিত্ব লোপ করতে, আর নকড়ি চেয়েছিল তাকে বাঁচাতে—দুজনের মধ্যে অতখানি বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তফাৎ ছিল এতখানি।

খড়ের ঘর—বেড়ার দেয়াল। দেয়ালে কোনকালে মাটি দেওয়া হয়েছিল, সে মাটি এখন খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, সেই জন্যেই রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে ফটিক ও নকড়ি ভিতরের সব কিছুই দেখতে পায়।

ম্লান প্রদীপের আলোয় পড়ছে হরেন—ছিন্ন একখানা মাত্তর বিছিয়ে বসেছে সে। ওধারে মেঝেয় ক্ষুদ্র একটি শয্যায় শুয়ে আছেন তার মা—রুগ্না মা—

মা বলছেন, "এবার শুয়ে পড় হরু,—রাত অনেক হয়েছে।" ম্লান হেসে হরেন বললে, "কে জানে—কাল আর পড়তে পাবো কি না মা! আজকের দিন তাই শেষ পড়া করে নিচ্ছি। কাল বিকেলে আমাদের ম্যাচ খেলা, এর ওপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে তা জানো না? হেডমাস্টার আর জমিদার মশাই হুকুম করেছেন—কাল শিমূলতলার হারানো সম্মান আমায় ফেরাতেই হবে। না পারি যদি—পরশু হতে স্কুলের দরজা আমার কাছে বন্ধ হবে, আর তোমাকেও ওদের ওখানে কাজ করতে দেবে না।"

মার দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে, শীর্ণ হাতখানা তিনি ছেলের মাথায় রাখেন—ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "ভগবান আছেন হরু! কথাই আছে—

জীব দিয়েছেন যিনি
আহার দেবেন তিনি।

তোর ভাবনা করবার তো কিছু নেই। ফুটবল খেলায় হেরে গিয়ে যদি তোর পড়া বন্ধ হয়, আমার কাজ যায়—তা যাক, তুই যা শিখেছিস তার জোরেই কোথাও একটা কাজ করতে পারবি, আমিও আর কোথাও কাজ করতে পারব।"

হরেন মাথা নত করে বসে থাকে।

এতদিন অনেক আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে। সে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়বে আই. এ., বি. এ., এম. এ. পর্যন্ত! যে করেই হোক, মানুষ সে হবে—মানুষ হতে চায় সে, কিন্তু তার কোন আশাই পূর্ণ হল না!

হরেনের চোখ দিয়ে শুধু টস্ টস্ করে জল পড়তে থাকে।

ম্যাচ আরম্ভ হয়—লোক ভেঙে আসে মাঠে—দুই পক্ষের লোকই এসেছে। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা কখনও হয়নি।

হ্যাঁ, চমৎকার খেলছে ছেলেরা। চকদীঘির ছেলেরা যেন আগুনের ফুলকি! তীরবৎ ছুটছে, বল মারছে। ওদিকে শিমূলতলার ছেলেরা কেবল আক্রমণ প্রতিহতই করছে, বল পাওয়ার সুযোগ তাদের হয়নি।

ফটিক নিজে গোল-কিপার—অলৌকিক শক্তি সাহস নিয়ে সে গোল বাঁচিয়ে চলেছে। আশ্চর্য হয়ে দেখবার মত জিনিসই বটে।

ওদিকে মুখ শুকিয়ে যায় হরেনের। জীবন-মরণ পণ করে খেলছে হরেন, আজকের খেলার ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করছে।

"গো—ও—ওল্।"

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার হাতে করতালি, চীৎকার শব্দ। শিমূলতলার ছেলে-বুড়ো সবাই মহোল্লাসে চীৎকার করে—"গো—ওল্।"

আশ্চর্য, ফটিক কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? বলটা

আটকাতে পারলে না! একেবারে শেষ মুহূর্তে বলটা তাকে ডিঙিয়ে চলে গেল, সে চেষ্টা করলেই ঠেকাতে পারত।

—"জয় শিমূলতলার জয়!"

মাঠের চীৎকার গ্রামের মধ্যেও শোনা যায়। হরেনের মা এতক্ষণ গলবস্ত্র অবস্থায় ঠাকুরের কাছে পড়ে ছিলেন—তাঁর কানেও এ কথা এসে পৌঁছল, হরেন গোল দিয়েছে।

চকদীঘি মাথা তুলতে পারে না, শিমূলতলা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মন্দিরে পূজা দিতে যায়।

এই হারজিতের বার্তা জানে শুধু দুজন। ফটিক নিজে জানে—ইচ্ছা করেই সে পরাজয় স্বীকার করেছে, আটকাবার ইচ্ছা থাকলে সে বলটা আটক করতে পারত, পারল না হরেনের মলিন মুখের পানে তাকিয়ে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

আর এ খবর জানে হরেন।

লোকে যতই জয়ধ্বনি করুক, মরমে মরে যায় হরেন! রুক্ষস্বভাব ফটিককে সে চিনেছে। তাই দূর হতেই সে তাকে মনে মনে প্রণাম জানায়।

পরিশিষ্ট

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ—শিল্পিশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহোদর। চারুশিল্প ও কারুশিল্প উভয়বিধ ক্ষেত্রেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন এবং অতঃপর আজীবন শিল্প ও সাহিত্য রচনায় কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী, কথাসাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। রূপকথা রচনায় বাঙলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'পথে-বিপথে' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচনা। শিল্প সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকখানি বিখ্যাত পুস্তক আছে। 'ভাগ্য-বিচার' রচনাটি তাঁহার 'রাজকাহিনী' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—বিখ্যাত হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁহাকে চাকুরি জীবন আরম্ভ করিতে হয়। বড়দার সাহচর্যে তিনি সাহিত্যচর্চা স্বরু করেন। বাঙলা সাহিত্যে তিনি 'দাদামহাশয়' নামে খ্যাত। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সংগঠনে ও 'উত্তরা' মাসিক পত্রের সঙ্গে তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত হইয়া থাকিবে। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে 'কাশীর কিঙ্কিৎ', 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'আই হ্যাজ্' বিশেষ বিখ্যাত। 'কালী ঘরামি' তাঁহার 'শ্রেষ্ঠগল্প-সংকলন' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রঃ—সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলায় ধূলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাঙলা ভাষার) 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হন। শিক্ষিত সমাজে তিনি উচ্চাঙ্গ কীর্তনের প্রবর্তক। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত। 'বিবি বউ', 'কানের দুল', 'সুখ-দুঃখ', 'পদামৃত-মাধুরী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সংকলন করিয়াছেন। 'সনাতনের সংসার-ত্যাগ' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্প-রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার জীবনের এই রাজনৈতিক ভূমিকা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহুলাংশে তাঁহার প্রেরণা-স্বরূপ হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পরে বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ—'ত্রিপত্র' (কবিতা), প্রথম উপন্যাস—'দীনার দান' ও প্রথম মুদ্রিত গল্প—'রসকলি'। 'হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা' লিখিয়া তিনি শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'দুই পুরুষ', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য-নিকেতন' তাঁহার রচিত উপন্যাস। 'রসকলি', 'বেদেনী' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহ। 'ডাক-হরকরা' তাঁহার একটি চমৎকার গল্প।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ—বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের অন্তর্গত ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃগ্রাম গুড়্‌প। তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিছুকালের জন্য বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদক ছিলেন। বাঙালী জীবনের

রসোজ্জ্বল মধুর চিত্র তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে প্রকাশিত। তাঁহার রচনায় কৌতুকরসের অবতারণাও আছে। 'আদরিণী' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প—ইহার করুণ রস পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতি', 'নবকথা', 'রত্নদ্বীপ', 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীঃ—আধুনিক যুগে মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি জীবনের নানা সমস্যা লইয়া বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বাঙলাদেশের প্রাচীন সংস্কার ও আধুনিক যুগের নূতন জীবনবোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে তাহা প্রকাশিত। 'বাংলার মেয়ে' তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা নাটকাকারে বহুবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। 'তরুণের অভিযান', 'ব্রতচারিণী', 'মানুষ ও পৃথিবী', 'মাটির মায়া' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনা।

প্রমথ চৌধুরীঃ—বাঙলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরী জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ব্যারিস্টার ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রেই ইঁহার প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ ঘটে। 'সবুজপত্র' তাঁহার সম্পাদিত অপরূপ মাসিক পত্র। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি চল্‌তি বাঙলা ভাষায় অভিনব রচনা-ভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। ইনি একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'বীরবলের হাল খাতা', 'চার-ইয়ারী কথা', 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'নীল-লোহিত' ইত্যাদি। 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটি 'ছোটদের বার্ষিকী' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণায় মুরাতিপুরে তাঁহার

মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃনিবাস বারাকপুর। তিনি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। তিনি কিছুকাল ভাগলপুরে একটি জমিদারী স্টেটে চাকুরি করেন, সেইখানেই তাঁহার 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। ইহা প্রকাশিত হইতে থাকিলে বাঙলাদেশে সাড়া পড়িয়া যায়। 'আরণ্যক' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁহার 'ইছামতী' গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-পারিতোষিক পাইয়াছে। পল্লীগ্রামের এমন অপূর্ব সুন্দর চিত্র আধুনিক যুগে আর কাহারও রচনায় নাই। 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'যাত্রাবদল', 'মৌরীফুল', 'মেঘমল্লার' প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ। 'রাজু পাঁড়ে' তাঁহার 'আরণ্যক' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। কবিগুরুর জীবনে রাজকীয় ঐশ্বর্যের সহিত ঋষিসুলভ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি চিরযুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সাধনায় ভারতবর্ষ আত্মরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সাহিত্যের বিভিন্নক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব স্ফুরণ ঘটিয়াছিল। 'গল্পগুচ্ছ' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাঙালীর মানস-ভূখণ্ডের এত বড়ো পরিচয় আর নাই—বাঙলার আকাশ বাতাস—নদী গ্রাম অরণ্য—জীবনযাত্রা—অখণ্ড সমগ্রতায় তাঁহার 'গল্পগুচ্ছে' ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ছুটি' গল্পটিতে কিশোর হৃদয়ের বেদনা বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ—বাঙলার সর্বজনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃনিবাস দেবানন্দপুর, হুগলী। দেবানন্দপুরে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূচনা হইলেও ব্রহ্ম-প্রবাসে এই জীবনের সত্য ও সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাব একদিন সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল। সহজ সুন্দর ও অনবদ্য ভাষায় তিনি বাঙালী জীবনের মাধুর্য ও তেজস্বিতাকে আবিষ্কার করিয়াছেন—বাঙালী জীবনের এমন রূপকার রবীন্দ্রনাথের পর তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তিনি লোকমুখে কথাসাহিত্য-সম্রাট আখ্যা লাভ করিয়াছেন—আখ্যাটি অযথা নহে। 'মহেশ' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। 'বিরাজ বৌ', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'দেনা-পাওনা', 'পথের দাবী', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি অপূর্ব উপন্যাসরাজি তাঁহার রচিত—এইগুলি বাঙলা সাহিত্যের গৌরব। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।